স্বস্তিকা

দাম : ষোলো টাকা
৭৫ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা।। ২৭ মার্চ, ২০২৩
১২ চৈত্র - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৫
website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ১২ চৈত্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২৭ মার্চ - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

ডেডলাইন সেপ্টেম্বর ! চুনকাম করলেও মমতার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো ঢুকবে না □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

সিভিক শিক্ষক হলে সিভিক মুখ্যমন্ত্রী নয় কেন ? □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

বিরোধীদের স্বার্থের সংঘাত দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক □ বিশ্বামিত্র □ ১০

বহুত্ববাদী ভারতবর্ষ শাশ্বতকাল রামচন্দ্রের শরণাপন্ন □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ১১

ত্রিবর্গের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামায়ণের যুগের অর্থনীতি □ ড. অনিল ঘোষ □ ১৩

ভারতবাসীর কাছে শ্রীরামচন্দ্রের মতো প্রিয়তম কেউ নেই □ গোপাল চক্রবর্তী □ ১৬

শ্রীরামচন্দ্র □ দীনেশচন্দ্র সেন □ ১৮

রাজা রাম এবং বঙ্গ-ভারত □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ২৩

ভারত ভাবনা ও শ্রীরামচন্দ্র □ ড. জিষ্ণু বসু □ ২৬

নদীসমা প্রেরণাকে পদ্ম সম্মান □ নিখিল চিত্রকর □ ২৭

বাঙ্গালি মেয়ের কিংবদন্তী হবার কাহিনি □ অনন্যা চক্রবর্তী □ ৩১

শবনপুরের কল্যাণময়ী কল্যাণেশ্বরী □ হীরক কর □ ৩৩

জাতীয় শিক্ষানীতির রূপায়ণ অবিলম্বে কার্যকর করা প্রয়োজন □ আনন্দ মোহন দাস □ ৩৫

মুর্শিদাবাদে জনবিন্যাস বদলে যাওয়ার এক ধারাবাহিক ইতিহাস □ বিনয়ভূষণ দাশ □ ৪৩

সঙ্ঘ প্রস্তাব : 'স্ব'-এর আধারে রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের সংকল্প নিতে হবে □ ৪৭

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ □ রঙ্গম : ৩৮-৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ৩ এপ্রিল ২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩ এপ্রিল ২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিদেশে আক্রান্ত ভারতীয়ত্ব

পাকিস্তানকেন্দ্রিক ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ যত দুর্বল হচ্ছে খালিস্তান আন্দোলন ততই মাথাচাড়া দিচ্ছে। খালিস্তানপন্থীরা বিদেশে হিন্দু মন্দির, বিভিন্ন ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। ভারতের মধ্যে খালিস্তানপন্থীদের একটা বড় অংশ ঘাঁটি গেড়েছে পঞ্জাব প্রদেশে। পঞ্জাব সরকার শক্ত হাতে এদের দমন করতে না পারলে ভবিষ্যতে আর একটা ভিন্দ্রেনওয়ালা তৈরি হতে পারে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা এই নিয়েই পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করবে। লিখবেন— ড. বিমল শঙ্কর নন্দ, ভবানীশঙ্কর বাগচী প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রামময় ভারত

ভারতবর্ষ রামময়। এই দেশের মানুষের শ্বাসে-প্রশ্বাসে রাম। এই দেশের শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার দিন রামনাম, আবার ভবলীলা সাঙ্গ করিবার দিনও রামনাম। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এক রাজকুমার এই ভারতভূমিতে আবির্ভূত হইয়া, সর্বপ্রকার দৈবীগুণে সমন্বিত হইয়া, এক আদর্শ শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে মানুষ তাঁহাকে নরচন্দ্রমা ও মর্যাদাপুরুষোত্তম বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। তাঁহারই জীবন ও কর্মের আখ্যানকে আদিকবি রামায়ণ নাম দিয়াছেন। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সেই রামায়ণ ভারতবর্ষের জনজীবনকে উজ্জীবিত রাখিয়াছে। আজও সেই ধারা সমানভাবে চলিতেছে। রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষের মানুষের একান্ত আপনার জন। উত্তরকালে তাঁহার প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা রামরাজত্ব নামে প্রচলিত হইয়াছে। গান্ধীজীও তাঁহার ইপ্সিত সমাজ ব্যবস্থার নাম দিয়াছিলেন রামরাজত্ব। স্বাধীন ভারতে তিনি রামরাজত্বের প্রবর্তন চাহিয়াছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতীয় সংবিধানের পৃষ্ঠায় রামচন্দ্রকে স্থান দেওয়া হইলেও তৎকালীন নেতৃবর্গ শুধুমাত্র ক্ষমতা ভোগ করিবার জন্য গান্ধীজীর রামরাজত্বের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, মানুষের মন হইতে রামকে অপসৃত করিতে পাঠ্যসূচি হইতে রামায়ণকে অপসারিত করা হইয়াছে। রামকে কাল্পনিক বলিয়া যুবমানসে ভ্রম উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতায় একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া কমিউনিস্টরা এই কাজটি সুচারু রূপে করিয়াছে। তাহারা প্রচার করিয়াছে বঙ্গপ্রদেশের সহিত শ্রীরামের কোনোরূপ সম্পর্ক নাই। রাম হিন্দি বলয়ের কেউ একজন। রামকে লইয়া মাতামাতি করা বাঙ্গালির শোভা পায় না ইত্যাদি। ইহার জন্য তাহারা শুধু ইতিহাসই বিকৃত করেন নাই, বাঙ্গালি মানসে ভ্রম উৎপন্ন করিয়া দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর ক্ষমতায় থাকিয়া পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন। কমিউনিস্টরা হিন্দু ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের ঘোরতর শত্রু। তাহারা রামায়ণ অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাইতেন, বঙ্গভূমির সহিত শ্রীরামের কত গভীর সম্পর্ক। রামায়ণে আদিকবি বর্ণনা করিয়াছেন— দ্রাবিড়দেশ, সিন্ধু-সৌবীরদেশ, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ-বঙ্গ-মগধ, মৎস্য, কাশী ও কোশল, এই সমৃদ্ধ রাজ্যগুলিতে যতদূর সৌরচক্র আবর্তিত হইতেছে, ততদূর পর্যন্ত এই বসুন্ধরা ইক্ষ্বাকু রাজবংশের অধীন। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে বঙ্গদেশ রামরাজ্যেরই অঙ্গ ছিল। শ্রীরামের সহিত বাঙ্গালি মানসের সম্পৃক্ততার বড়ো প্রমাণ হইল শ্রীরাম প্রবর্তিত শারদীয় দুর্গাপূজা। বাল্মীকি রামায়ণে ইহার উল্লেখ না থাকিলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গাপূজার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কালিকাপুরাণ-সহ বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গাপূজার উল্লেখ রহিয়াছে। বঙ্গজীবনের সবচাইতে বড়ো অনুষ্ঠান দুর্গাপূজা শ্রীরামচন্দ্রই প্রবর্তন করিয়াছিলেন ইহা ভুলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। কমিউনিস্টরা সত্য বিকৃত করিয়া যে পাপ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের বঙ্গভূমি হইতে উৎখাত হইতে হইয়াছে।

দেশের জনমানস হইতে শ্রীরামকে ভুলাইয়া দিবার মহাপাপ কংগ্রেসও করিয়াছে। রামসেতু ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা করিয়া তাহারা দেশের কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসে আঘাত হানিয়াছে। আদালতে হলফনামা দিয়া রামের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিটি জাতি,গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় তাহাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি অনুসারে রামকে গ্রহণ করিয়াছে। রাম কোনো কাল্পনিক দেবতা নহেন ; তিনি ভারতবর্ষের সমাজজীবনের প্রাণভ্রমর। তিনি এই ভূমিরই রক্তমাংসের মানুষ। ভারতবাসী তাঁহাকে নরশ্রেষ্ঠ হিসাবে দেখিয়াছে। শ্রীরামের জীবনগাথা যে রামায়ণ তাহা ভারতবর্ষের ব্যক্তিজীবন, গার্হস্থ্যজীবন এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রজীবনের বিজয়বার্তা ঘোষণা করিয়াছে। রামচন্দ্র সত্যধর্মের প্রতীক। তাই বোধ হয় একটি মহাদেশের সমস্ত দেশ তাঁহাকে নায়ক রূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলি রামকে অস্বীকার করিয়া সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। এই দেশের কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করিয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম নাকি তাহাদের নিকট কুসংস্কার। বর্তমানে রামভক্তির প্রাবল্যে দিশাহারা হইয়া তাহারা হাতে লইতে শুরু করিয়াছে রামায়ণ-মহাভারত, গীতা, উপনিষদ। অবশ্য ইহা কেরলের কমিউনিস্টদের কথা। বাঙ্গালি কমিউনিস্টরা সবকিছুই বিলম্বে অনুধাবন করিয়া থাকেন। ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে, কংগ্রেস- কমিউনিস্ট মুক্ত ভারতে রামভক্তির যে জোয়ার আসিয়াছে, তাহা রুখিবার সাধ্য কাহারও নাই।

সুভাষিতম্

উপকারিষু যঃ সাধুঃ সাধুত্বে তস্য কো গুণঃ।

অপকারিষু যঃ সাধুঃ সঃ সাধু সদ্‌ভিরুচ্যতে।।

উপকার করা ব্যক্তির সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার করা, তাতে সাধুত্বের কিছু নেই। অপকার করা ব্যক্তির সঙ্গে যিনি সদ্‌ব্যবহার করেন তাঁকেই বিদ্বানরা সাধু বলেন।

ডেডলাইন সেপ্টেম্বর !

চুনকাম করলেও মমতার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো ঢুকবে না

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ডেডলাইন সেপ্টেম্বর ২০২৩? ভবিষ্যদ্‌বাণীর মতো শোনাচ্ছে। বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন ডেডলাইন ডিসেম্বর। কিছু হলো কিনা তা বুঝতে মানুষকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। দুর্নীতির মাকড়সার জাল মমতার দল আর প্রশাসনকে জড়িয়ে ফেলেছে। সে জাল কেটে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। সেপ্টেম্বর থেকে তার রূপ আরও বেশি করে প্রকাশ্যে আসবে বলেই শুনেছি। তখনই হয়তো শুরু হতে পারে মমতার বিদায়কাল। কেন সেপ্টেম্বর? ঘটনার পরম্পরায় তাই আন্দাজ হচ্ছে। রাজনীতি হলো পদ্মপাতায় জল। কোনদিকে গড়াবে বলা মুশকিল। এটা বুঝছি, মে মাসে পঞ্চায়েত ভোটের পর তৃণমূলের শক্তি অনেকটাই কমে আসবে। চুয়াত্তর হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে বিরোধীরা ২৫ থেকে ৩০ হাজার আসন পেলে অবাক হবো না। তাতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিরোধী তদন্ত আরও দানা বাঁধবে।

ফলে মমতার রথচক্র মেদিনীগ্রাস অস্বাভাবিক নয়। মমতার প্রতি দলীয় আস্থা কমবে। কেউ সঙ্গে থাকবে, কেউ তার হাত ছেড়ে দেবে। রাজনীতিতে প্রথম উদাহরণ নেই বললেই চলে। ফুটো ব্যাগে কেউ পয়সা রাখে না। পঞ্চায়েত ভোট মমতার অ্যাসিড টেস্ট বা অগ্নি পরীক্ষা। রাজ্যের মানুষ আর দলের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতার 'রেফারেনডাম' বা জনাদেশ। তাই আগেভাগেই নতুন করে দলের রং আর পালিশ পালটাতে চাইছেন মমতা। তৃণমূল এখন ভাঙা ঘর, ভোটবাক্সে তার আলাদা কিছু প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত। ফলে চুনকাম করে কোনো লাভ নেই। মমতা যে অনেকটাই দিশেহারা তার প্রমাণ বেআইনি ভাবে চাকরি পাওয়া নিকৃষ্ট অপরাধীদের নিয়ে তার অসংলগ্ন কথা। তার নিজের মানুষরাই আড়ালে বলছেন যে তাঁর মানসিক ধৈর্যের অভাব ঘটছে। মমতার মতো একসময়ের ঝোড়ো নেতারা এভাবেই হারিয়ে যায়।

ইন্দিরা গান্ধীর অগণতান্ত্রিক আর অন্যায় কাজকারবারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা জয়প্রকাশ নারায়ণ সেভাবেই হারিয়ে গিয়েছেন। জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু রাজ্যের মানুষের কেউ ছিলেন না। ওরা ছিলেন মুখোশ আর সিপিএম হলো মুখ। এ ধারণায় অনেকের আপত্তি থাকলেও আমি যত্নবান। তৃণমূলের জমানায় মমতাই মুখ আর মুখোশ। তাই দুর্নীতির আগুনে যখন মুখ পুড়ছে তখন মুখোশও পুড়বে। মমতার অতি আপন পার্থ চট্টোপাধ্যায় আর অনুব্রত মণ্ডল এখন জেলে। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি কীভাবে লড়াকু মমতাকে সবদিক থেকে সাহায্য করতেন পার্থবাবু।

> **রাজ্যের মানুষ হয়তো মমতার মুখের বদল চাইছেন। বাকি নেতারাও রাজ্যের কাঁধে বোঝার মতো। মমতা ভালোই বোঝেন। তাই ভাঙা ঘর ভাঙা থাকবে। প্রসাধনী পরিবর্তনে কোনো লাভ হবে না।**

পার্থবাবু একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় উচ্চপদে চাকরি করতেন। সংগঠন গড়তে 'কেষ্ট' মণ্ডল কীভাবে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষমতার অপব্যবহার করতে দিয়ে এখন দুঃসহ এই দুই ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করছে মমতা। যা থেকে টলে যেতে বাধ্য তার ক্ষমতার আসন। যেভাবে তৃণমূল চলছে তাতে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগেই তারা নখ-দাঁতহীন বাঘে পরিণত হবে। সেই সঙ্গে ফিকে হয়ে যাবে মমতার সংগ্রামী ভাবমূর্তি। সন্দেহাতীতভাবে সতীর্থদের তা উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না। প্রধানভাবে তদন্তের গনগনে আঁচ যদি মমতার পরিবারকে ততদিনে গিলে ফেলে।

এই মুহূর্তে মমতার পরিবারের তিনজন দুর্নীতিচক্রে জড়িয়ে গিয়েছেন— ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাই কার্তিক আর ভাইয়ের স্ত্রী কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়। লাইনে রয়েছেন পরিবারের আরও সদস্য। মমতার অস্বস্তি যে তারা শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি মমতার ভাইঝিও চাকরি চুরির দায়ে ধরা পড়ে তার বেআইনি চাকরি খুইয়েছেন। অনেকের দাবি, শারীরিক কারণে তিনি আগেই চাকরি ছেড়েছিলেন। বীরভূমের কেষ্টর পরিবর্ত মুখ হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছেন মমতা। মুখ বদলের রাজনীতিতে মমতা লাভবান হবেন বলে মনে হয় না। এ রাজ্যের মানুষ হয়তো তাঁর মুখের বদল চাইছেন। বাকি নেতারা রাজ্যের কাঁধে বোঝার মতো। অপ্রাসঙ্গিক বটে। মমতা তা ভালোই বোঝেন। তাই ভাঙা ঘর ভাঙা থাকবে। প্রসাধনী পরিবর্তনে কোনো লাভ হবে না। □

সিভিক শিক্ষক হলে সিভিক মুখ্যমন্ত্রী নয় কেন?

শিক্ষাদরদিষু দিদি,

আপনি বিভিন্ন বক্তৃতায় নিজের কৃতিত্ব যখন জাহির করেন তখন আমার বুকটা ফুলে যায়। শুনি, আপনি বলছেন, কীভাবে রাজ্যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে আপনার জমানায়। সত্যি দিদি তখন দূর থেকেই আপনাকে প্রণাম করি।

কিন্তু দিদি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানে কি শুধু ইট কাঠের কাঠামো? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানে তো শিক্ষার মন্দির। সেখানে গুরুর আসনে থাকবেন শিক্ষকেরা। কিন্তু দিদি সেই আসল বিষয়টিকেই বাদ রাখা হয়েছে। যাঁরা শিক্ষক তাঁরা আদৌ শিক্ষক কি না তা নিয়েই তো প্রশ্ন। বলা হচ্ছে আপনি ক্ষমতায় আসার পর থেকে যা নিয়োগ হয়েছে তার বড়ো অংশই নাকি অযোগ্য। প্রমাণও মিলছে। সরকার স্বীকারও করে নিয়েছে। অনেকের চাকরি গিয়েছে। কারও কারও চাকরি যাওয়ার উপক্রম।

কিন্তু দিদি, তার চেয়েও বড়ো প্রশ্ন সম্প্রতি আপনার সরকার এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রাথমিকের পড়ুয়াদের পড়াবেন সিভিক ভলান্টিয়াররা। যাঁদের বেশিরভাগের শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী। বেতন সর্বোচ্চ ন' হাজার টাকা। এত কম বেতনে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের নানারকম অপকর্মে যুক্ত হতে হয়। এমনকী চাকরিটি পাওয়ার জন্য সারা জীবনের জন্য শাসক দলের কোনও নেতার 'দাস' হয়ে থাকতে হয়। ফলে তিনি যা বলেন সবই করতে হয়। প্রাথমিকভাবে এঁদের নিয়োগ হয় যান নিয়ন্ত্রণের জন্য। যদিও সেই কাজের জন্যও কিছু প্রশিক্ষণ দরকার। সেটা তাদের নেই।

তাই বলে প্রশিক্ষণ ছাড়াই স্কুল ছাত্রদের পড়ানো যায়? 'অঙ্কুর' নামের এক প্রকল্পের অন্তর্গত ৪৬টি স্কুল-সহ মোট ৫৫টি কেন্দ্রে অঙ্ক ও ইংরেজি পাঠদানের দায়িত্বটি স্কুলশিক্ষকদের উপর নয়, বরং ন্যস্ত হবে শতাধিক সিভিক ভলান্টিয়ারের উপর। বিতর্ক তৈরি হতেই পুলিশ বিবৃতি দিয়ে বলেছে স্কুলে নয়, এই ক্লাস হবে অন্য কোথাও।

কিন্তু দিদি, প্রশ্ন অন্য জায়গায়। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, একজন প্রাথমিক শিক্ষককে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পর ডিএলএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হয়। অর্থাৎ পেডাগজি বা শিক্ষাবিদ্যার দর্শন একেবারে প্রাথমিক স্তরে পড়ানোর জন্যও যে বিশেষ যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের কথা বলে রাজ্যের সরকারি নীতি সেই বিষয়টি আপনার অজানা নয়। শুধু সিভিক ভলান্টিয়ার কেন, থানার আধিকারিক বা হাসপাতালের ডাক্তার অথবা হেড অফিসের বড়োবাবু, কারও এই যোগ্যতা নেই। সব কাজের জন্য সবাই পটু হতে পারে না। এই কথাটা তো মানতেই হবে দিদি।

শিক্ষকের ঘাটতি এ রাজ্যে প্রকট। তার উপরে কেনা চাকরি হারাচ্ছেন অনেকে। আপনি অবশ্য আদালতের নির্দেশে যাঁদের চাকরি গিয়েছে তাঁদের 'আইনত' ফেরাতে চান। সেটা কী করে সম্ভব জানি না। কেউ জানে কি? সেটাও জানি না। কিন্তু কোনও সরকারি দপ্তর যদি নীতিগত ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, যাঁদের শিক্ষকতার যোগ্যতা নেই তাঁদের দিয়েই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করানো হবে, তবে তা ঘোর উদ্বেগের কথা। এই কাজটিকে পুলিশ যদি জনসংযোগের মাধ্যম বলে বিবেচনা করে, তবে তা কাণ্ডজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তের পরিচয়।

> আচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর যদি মাথা খারাপ হয়ে যায়, তবে কি সিভিক মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হবে?

তাহলে তো দিদি এর পরে কোনও থানায় লোক কম হলে আপনার সরকার বলবে, স্কুলের শিক্ষককে ওই কাজ সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে।

অনেকে বলছেন এই সিদ্ধান্তের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে রাজ্যের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। সেখানে জোড়াতালি দিয়ে কোনওক্রমে কাজ চালিয়ে যাওয়াই মূল কথা। অথচ দীর্ঘমেয়াদি মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য যা করা দরকার তা করা হচ্ছে না। বরং রাজ্যের মেধা, মানবসম্পদ যাতে নষ্ট হয়ে যায় সেই চেষ্টাই করে যাওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড তৈরি হয়। সেটাই তো নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে দিদি।

তবুও দিদি আপনার ভাই হিসেবে আমি অতীতের মতো আপনার পাশে। বরং আমি চাই সব কাজে সবার অধিকার থাকা উচিত। আগামী দিনে সব হাসপাতালে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা উচিত। তাঁরাই চিকিৎসা করবেন। তাঁরাই যানজট সামলাবেন। তাঁরাই সরকার চালাবেন।

সেদিন পাড়ার চায়ের দোকানে এইসব নিয়ে কথা হচ্ছিল। তখন কে একজন বলে উঠল, 'আচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর যদি মাথা খারাপ হয়ে যায়, তবে কি সিভিক মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হবে?' বিশ্বাস করুন দিদি, আমি কোনও কথা বলিনি। ওখান থেকে চুপটি করে উঠে এসেছি। এমন ভাব করেছি যেন কিছুই শুনিনি।

মনে মনে স্লোগান দিয়েছি— জয় সিভিক বাংলা। □

অতিথি কলম

কে.বি.এম. চৈতন্য

সিনেমার মৃদুস্বরে কথোপকথন কিন্তু সজাগ করে

সম্প্রতি চলচ্চিত্র সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিশ্বজয়ীর মানপত্র অস্কার জিতেছেন ভারতীয় তথ্যচিত্র Elephant Whisperers। এর বাংলা অর্থ হাতিটির কানে কানে কথা বলছে। অবশ্যই যে সমস্ত চলচ্চিত্র উদ্দাম চিৎকার করে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের দখল নিতে চায়, এই ধরনের ছবি তাদের বদলে সৃষ্টিশীল বিকল্পের দাবিদার। একই সঙ্গে আশার কথা তারা এখন নতুন বিনিয়োগের সন্ধান এবং ছবি মুক্তির নতুন চ্যানেল পেয়েছে।

'নাটু নাটু' প্রথম চরণের গানটি ও Elephant Whisperers-এর দ্বৈত অস্কার জেতা ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের দুটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে। গানটি ভারতের দক্ষিণী চলচ্চিত্রের একটি বিপুল হিট ছবির সুনির্মিত নৃত্য সংগীত যা দর্শকদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়। দ্বিতীয় বিজয় কেতনটি উড়িয়েছে একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতি দম্পতির দুটি অক্ষম হাতিকে নিয়ে অসাধারণ serious একটি তথ্যচিত্র।

অতি দীর্ঘদিন ধরে এই ধারণাটাই চলে আসছিল বিশ্বের মনে ভারতীয় চলচ্চিত্র মূলত বলিউডে তৈরি হিন্দি ভাষায় ছবি। এই সূত্রে উল্লেখ্য 'নাটু নাটু' গানটি তেলুগু ভাষায় তৈরি। সুপারহিট RRR ছবির। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে সিনেমা শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাতাত্ত্বিক সংস্থা 'omax' জানিয়েছে গত বছর তেলুগু সিনেমার ব্যবসা ২১২ মিলিয়ন ডলার যেখানে বলিউড ১৯৭ মিলিয়ন। বিগত কয়েক বছরে দক্ষিণী ছবির এই উর্ধ্বগামী ধারা বলবৎ আছে। শুধু ভারত নয়, সমগ্র বিশ্ব আজ দক্ষিণ ভারতের এই চলচ্চিত্রীয় অগ্রগতির ওপর নজর রাখছে।

বিশ্ব আঙিনায় : অবশ্যই বরাবরের জনপ্রিয় ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলির রীতিতে তৈরি ছবিগুলি জনপ্রিয়তার ধারা অপ্রতিহত রাখলেও যে ছবি দুটি অস্কারের জন্য মনোনীত করে পাঠানো হয়েছিল তারা উভয়েই তথ্যচিত্র। এর মধ্যে পরিচালক শৌনক সেনের All that breathes ছবিটি তথ্যভিত্তিক কাহিনিচিত্র ও কার্তিকী গঞ্জালভেসের Elephant Whisperers নিতান্তই স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের আওতার অন্তর্গত।

জানা দরকার, All that breathes ইতিমধ্যেই Sundance উৎসবে সর্বোত্তম জুরি পুরস্কার জিতেছে। একই সঙ্গে ফ্রান্সের অভিজাত কান উৎসবে Golden eye পেয়েছে। কিন্তু কার্তিকী গঞ্জালভেসের তথ্যচিত্রটি সবাইকে ছাড়িয়ে সেরা ছোটো তথ্যচিত্রের অস্কার জিতে দেশকে শ্রেষ্ঠতার স্বাদ দিয়েছে।

শৌনক ও কার্তিকী দু'জনেই আনকোরা তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা। তারা একজন জীবনের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র, একজন একেবারে প্রথম ছবিটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে চমকপ্রদ হলো তাদের তথ্যচিত্রের বিষয় নির্বাচন যা বর্তমান সময়ের বিচারে অবাক করা। ভারতীয় চলচ্চিত্রের দর্শক আর যাই দেখুক না কেন তারা তথ্যচিত্র দেখতে কখনই হল-মুখো হয় না। চিরাচরিত ভাবে এই ধরনের তথ্যচিত্রগুলি অর্থ জোগানের ক্ষেত্রে দূরদর্শন, ফিল্ম ডিভিশন বা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ওপরই নির্ভর করে। এই অর্থ বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্ন শর্তে দিয়ে থাকে। কিন্তু শেষ দশ বছরে সরকারি তরফে এই ধরনের অর্থ বিনিয়োগ যথেষ্ট কমে এসেছে। তথ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম যেটা দরকার হয় বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত নিবিড় গবেষণা এবং দীর্ঘ সময় ধরে ছবিটি তোলা। বোঝাই যায় এই ধরনের ছবিগুলি একটু বিশেষ ধরনের দর্শককে মাথায় রেখেই নির্মিত হয়। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে পূর্বনির্ধারিত প্রচার করার বাসনা নিয়ে নির্মিত হওয়ার পরিবর্তে কিছুটা নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীতে তথ্যচিত্রগুলি মানুষকে নিজের মতো করে ভেবে দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করতে সহায়তা করে।

লক্ষ করবেন, গত দশ বছরে ২৪ × ৭ সংবাদ চ্যানেল খোলায় একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে। এর মানে মানুষ দৃশ্যগ্রাহ্য ঘটনা বেশি পছন্দ করছে। আর খবর চ্যানেলে পরিবেশনের আগে ঘটনার অনেক কিছুই একটু সহজপাচ্য, সরলীকৃত এবং মনোমতো মতামতে ভেজাল করে দেওয়া হয়। এই খবরের চ্যানেল বন্যা, ব্যাপক সোশ্যাল মিডিয়ার বিস্তার, সঙ্গে মোবাইল নেটওয়ার্কের দাপট চললেও কেউই আন্তরিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ ছবি তুলে ধরতে পারছে না। কিন্তু যেহেতু তথ্যটি বাস্তবে উল্লেখিত ৩টি মাধ্যমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় থেকেই নিজেকে দাঁড় করাতে চায়, তাই তাদের লড়াইটা ভেজালের অভাবে অসম হয়ে পড়ে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে All that breathes-কে HBO এবং Elephant Whisperers-কে netflix-এর মতো বেসরকারি সংস্থা সার্পোট দেয়। এতে অন্য মাধ্যমগুলিতে ঢোকা কঠিন হলেও নতুন বড়ো দরজা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। OTT নামের নতুন বেসরকারি মাধ্যম নির্দিষ্ট দর্শকদের কাছে একেবারে বাড়ির বৈঠকখানায় পৌঁছে দেওয়ার রাস্তা করে দিয়েছে। বিশেষভাবে নির্মিত শৈল্পিক ছায়াছবিগুলি যেমন দেশের ভেতর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার আগেই অধিকাংশ সময়ই বিদেশে প্রদর্শিত হয়ে প্রশংসিত হয়ে নির্মাতাদের উদ্বুদ্ধ করে দেয়। এই ছোটো ছবিগুলির OTT ব্যবহারের মাধ্যমে তাও ঘটছে।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, রাম রেড্ডির কান্নড় ছবি 'তিথি' সারা কানাড়া জুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। জনতার কৌতূহল ব্যাপক বেড়ে যায় ছবিটির বিশ্ব জুড়ে দর্শক উৎসাহের খবরে।

ছবিটি চলচ্চিত্র উৎসবে জায়গা পাওয়ার ফলে এটি ঘটে। ঠিক একইভাবে শৌনক ও কার্তিকীর ছবি দুটি প্রথমে সারা বিশ্বের দর্শকের অনুরাগে ভারতের মুখোজ্জ্বল করে, তারপরে দেশের অভ্যন্তরীণ দর্শককে তারা আকর্ষিত করে তোলে। আজকের দিনের ঘটনার দিনপঞ্জীর এক সৃষ্টিশীল পুনর্নির্মাণই তাত্ত্বিক অর্থে শিল্প। অনেক শিল্পী ঘটমান বাস্তবকে কাঠামো করে অনুপ্রাণিত হয়ে নাটকীয় ছবি তৈরি করেন। যাকে বলে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে'। আর কেউ কেউ নিখাদ বাস্তবকেই অবলম্বন করে তাদের প্রতিক্রিয়া চলচ্চিত্রায়িত করেন। আর এইটাই আর এক অর্থে হয়ে ওঠে সাংবাদিকতা বা অনেক সময়ই গল্পহীন চলচ্চিত্র বা তথ্যচিত্র। সিনেমায় পর্দায় চলচ্চিত্র হচ্ছে গল্পকেন্দ্রিক, আর তথ্যচিত্র গল্পহীন। চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যকাররা বহু ক্ষেত্রে গল্পকে ভেঙে একটি নিজস্ব কাল্পনিক জগৎ তৈরি করেন। আর তথ্যচিত্র নির্মাতা নিরেট বাস্তবকে কেবল ঘষে মেজে দর্শকের কৌতূহল ধরে রাখার জন্য সত্যকেই উদ্ভাসিত করেন।

একটি বিশেষ চলচ্চিত্রীয় ভাষা : এত বড়ো দুটি আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম পুরস্কার পাওয়ার জন্য ছবি দুটি কয়েক লাইন আলোচনার দাবি রাখে। All that breathes ছবিটিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দু'টি ভাই দিল্লির দূষিত আকাশ থেকে বড়ো কালো রঙের ঘুড়ির পড়ে যাওয়া আটকাতে মরিয়া। কিন্তু ছবিটির আবহ সংগীতে পেছন থেকে একটি অন্যধরনের দূষণের সাংগীতিক অনুষঙ্গ ভেসে আসে যা নিতান্তই সামাজিক ও রাজনৈতিক। যার উৎস রয়েছে ওই শহরের মধ্যেই এবং শহর সাক্ষী হয়েছে।

একই ভাবে Elephant Whisperers একটি ছোটোদের গল্পের মতো উন্মোচিত হয়। আমরা প্রত্যক্ষ করি অরণ্য, এক দম্পতি, একটি অনাথ হাতি এবং এই বৃত্তেই তাদের জীবন। এরই মধ্যে একটি শিশু হাতি তাদের অরণ্য বাসভূমিতে আসে। বড়ো হাতিটি তার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিপাত করে এবং বদমেজাজ দেখায়।

ভাবলে অবাক হবেন, ৪৫০ ঘণ্টা ধরে ছবির footage বা shot নেওয়া হয়েছিল দীর্ঘ ৫ বছর ধরে। E.W. ছবিটি ভয় পাওয়ানোর ভাষা ছেড়ে মাধুর্য বিতরণের চলচ্চিত্রীয় ঐশ্বর্য বেঁধে নেয়। ছবির তামিল উপজাতির দম্পতিটি যে উচ্চারণে কথা বলেছে, তামিল ভাষা জানাদের কাছেও সাব টাইটেল ছাড়া তা দুর্বোধ্য মনে হবে। এতে বোঝা যায় এই তথ্যনিষ্ঠা কতটা সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য। প্রত্যন্ত বনাঞ্চলে বসবাসকারী একটি বিশেষ ঘটনা তুলে ধরে ছবিটি আধুনিক সভ্যতাকেই আয়না দেখিয়েছে। কোনো শিক্ষণীয় বাণী নয়, কোনো বড়ো বড়ো কথা নয়, চলচ্চিত্রটি আমাদের নিয়ন্ত্রণ ও দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলে।

এই জন্যই ছবিটির নামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ছবিটিতে চিৎকৃত ভাষ্য নেই, আছে শৈল্পিক সুষমা। আমার জানা নেই পৃথিবীর অন্য দেশেও তথ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুনত্বের কোনো পথ খুলছে কিনা? কিন্তু আমাদের এখানের Content creators-রা নিত্য নতুন ভিডিয়ো প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে বাজারে ছেড়ে মানুষকে আসক্ত করে দেওয়ার যে চেষ্টা চালাচ্ছে তার বিপরীতে শৌনক ও কার্তিকীর গোটা অন্তর দিয়ে গবেষণা চালিয়ে এই কঠিন শিল্পকর্ম নির্মাণ নিশ্চিত ভারতের নতুন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অনুপ্রাণিত করবে। এ আশা দুরাশা হবে না আশা করি।

(লেখক ২০২৩ অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা)

শোকসংবাদ

জলপাইগুড়ি শহরের স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ দেবব্রত গোস্বামী গত ৪ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী তথা জলপাইগুড়ি প্রথম সারদা শিশুমন্দিরের সম্পাদক ছিলেন।

* * *

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ি খণ্ডের স্বয়ংসেবক লোকেশ রায় সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তিনি এক সময় খণ্ডকার্যবাহ, মহকুমা কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শিশুমন্দিরের আচার্য ছিলেন।

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

১. প্রকাশনের স্থান : ২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬,
২. প্রকাশনের সময় : সাপ্তাহিক। **৩. মুদ্রকের নাম :** শ্রী সারদা প্রসাদ পাল। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪।
৪. প্রকাশকের নাম : শ্রী সারদা প্রসাদ পাল। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪।
৫. সম্পাদকের নাম : তিলক রঞ্জন বেরা। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** নিউ টাউন, ইন্দা, খড়্গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১৩০৫।
মালিকানা : শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস্ ফাউন্ডেশন।
ঠিকানা : ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬।
শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস্ ফাউন্ডেশন -এর ডাইরেক্টরবৃন্দ :
শ্রী সারদা প্রসাদ পাল, ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪।
শ্রী তিলক রঞ্জন বেরা, নিউ টাউন, ইন্দা, খড়্গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১৩০৫।
শ্রী অজয় গোয়েল, লেক প্লাজা, ফ্ল্যাট - ৪এইচ, ৪র্থ তল, ২৭৭, যশোর রোড, তেঁতুলতলা, লেক টাউন, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন কোড - ৭০০ ০৪৮
শ্রী অরিন্দম সিংহ রায়, বাউড়িয়া নর্থ মিল, চকমধু, রাধানগর, হাওড়া, পিন কোড- ৭১১৩১০

আমি শ্রী সারদা প্রসাদ পাল সজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর
শ্রী সারদা প্রসাদ পাল
শ্রী সারদা প্রসাদ পাল

তারিখ ঃ ২৭.০৩.২০২৩

বিরোধীদের স্বার্থের সংঘাত দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদের বিরাট বড়ো ভূমিকা রয়েছে। সরকার পরিচালনায় কোনো ভুল-ত্রুটি হলে তা সংশোধন বিরোধীরা করবেন, এমন আশা সংসদীয় গণতন্ত্রে অনর্থক নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিরোধীদের তৈরি রাখা হয় এই কারণেই কোনো কারণে সরকারপক্ষ সরকার চালাতে না পারলে এবং নির্বাচনের দরকার না হলে বিরোধীরাই সরকারে বসে প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব পালন করবেন। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতেও বিরোধীদের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে।

কিন্তু স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েমের জন্য বিরোধীদের কিছু অবমাননা যে হয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হয়। নেহরুর আমলে বিরোধী নেতা হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বন্দিদশায় অপমৃত্যু মনে করিয়ে দেয় বিরোধী নেতৃত্ব নেহরুর আমলে কী অবস্থায় ছিল। নেহরু-কন্যা ইন্দিরার আমলে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার মাধ্যমে সার্বিকভাবে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। রাজনৈতিক মত ও পথের বাধা ভুলে সব বিরোধীরা যে এক ছাতার তলায় আসতে পারে সেই সময়ই তা দেখা গিয়েছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতার মধুভোগ করার প্রবণতাও আবার কিছু রাজনৈতিক দলের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

যেমন সিপিআইএম। তারা রাজ্যে ক্ষমতায় থেকেছে। আর সেই ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে কেন্দ্র সরকার বিরোধী স্লোগান তুলে, কেন্দ্রীয় সরকারে কখনো যোগদান না করে মেকি বিরোধী রয়ে গেছে। এই গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বিরোধীদের অবস্থান নিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন তোলা যায়। যেমন এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা হলো তা নেতা-কেন্দ্রিক। কিন্তু কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করেন বিরোধী দলের কর্মীরা? এই রাজ্যের কথাই ধরা যাক, তৃণমূলের আমলে বিরোধী দলের কর্মীদের সঙ্গে কেমন অমানবিক ব্যবহার করা হয়, ২০২১ সালে বিধানসভার ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় সবাই তা দেখেছেন। এই সংস্কৃতি বাম আমলেই শুরু হয়েছিল। তারও আগে সাঁইবাড়ি, বাম আমলে নেতাই, সিঙ্গুর, ধানতলা, বানতলা প্রভৃতি জায়গায় বিরোধীদের কচুকাটা করে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের বন্দোবস্ত করেছিল সিপিআইএম। আরও একটা ব্যাপার, বাম আমলে বিরোধী নেতাদের কিনে নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিপর্যস্ত করার যে নিঃশব্দ চল শুরু হয়েছিল, তৃণমূল আমলে তা নিঃসন্দেহে আরও ব্যাপকতর হয়েছে। বাম আমলে এইরকম কেনা বিরোধী নেতাদের তরমুজ নামে অভিহিত করা হতো, অর্থাৎ বাইরে সবুজ ভেতরে লাল। সবমিলিয়ে স্বাধীনতার পর থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে বিরোধীদের অগ্রগণ্য ভূমিকা থাকলেও তাদের গণতান্ত্রিক কণ্ঠরোধ করার প্রবণতা কিন্তু আমাদের গণতন্ত্রকে কলুষিতও করেছে।

অবশ্য আমাদের দেশের গণতন্ত্রে বিরোধীদের ভূমিকার কিছু উজ্জ্বল ছবিও আছে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে বিরোধীদের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হয়েছিল, শুধু তাই নয়, বিরোধীদের প্রয়োজনে দেশের কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন এবং ভারতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বাজপেয়ী নিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের কালে অটলবিহারী নিজেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সময়ে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দলের প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে দেশের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর তাঁর পূর্বসূরির পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিরোধীদের যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

তবে তাঁর শর্ত ছিল, দেশপ্রেমের সঙ্গে আপোশ করা যাবে না। সংসদীয় রীতি অনুযায়ী যে বিরোধী দল লোকসভার মোট আসনের অন্তত দশ শতাংশ লাভ করবে, সর্বোচ্চ আসন সংখ্যার ভিত্তিতে তাকে প্রধান বিরোধীদের মর্যাদা দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী মোদী জমানায় ২০১৪ ও ২০১৯ এই দুই লোকসভার ফলের ভিত্তিতে সংসদের নিম্নকক্ষে অর্থাৎ লোকসভায় কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

সংসদের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভায় অবশ্যই কংগ্রেসের সেই যোগ্যতা আছে এবং কংগ্রেস সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দলও। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধীরা এতকাল দেশের শাসকের বিরোধিতা করতে গিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর সুযোগ নিয়ে দেশদ্রোহিতা করেছে। এর মধ্যে বিরোধীদের যে কায়েমি স্বার্থ লুকিয়ে ছিল তা ক্রমশ প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। সেই স্বার্থের সংঘাত আজ তীব্র আকার ধারণ করছে। সেই তীব্রতা এতটাই যে তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টির মতো আঞ্চলিক দলগুলো আজ কংগ্রেসের নেতৃত্ব মানতে নারাজ। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ভেঙেই তৃণমূলের জন্ম। উত্তরপূর্বের কিছু রাজ্য যেমন মেঘালয়, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্যে কংগ্রেসের ভাঙনেই তৃণমূলের জন্ম। তাই তৃণমূল চাইবেই কংগ্রেস হৃতশক্তি হোক, তাতে তাদের শ্রীবৃদ্ধি হবে। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে গান্ধী-নেহরু পরিবারের গড়ে গত লোকসভায় আমেঠিতে রাহুল হেরেছেন, রায়বেরিলিতে জিতলেও সোনিয়া অসুস্থ। তাই মমতার পাশে দাঁড়িয়ে সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ বলেছেন, সামনের লোকসভায় রায়বেরিলি আমেথিতে তাঁরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবেন। বলা বাহুল্য, মোদী জমানার প্রথমদিকে ক্ষমতা দখল করতে মরিয়া বিরোধীরা যেমন দেশদ্রোহিতাকে প্রশ্রয় দিতে পিছুপা হননি, আজ তেমনি স্বার্থের সংঘাতে নিজেদের মধ্যে মুষলপর্ব শুরু করেছেন। এই ইঙ্গিত দেশের শাসকদলের পক্ষে শুভ লক্ষণ হতে পারে কিন্তু এই দুই প্রবণতাই দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। □

বহুত্ববাদী ভারতবর্ষ শাশ্বতকাল রামচন্দ্রের শরণাপন্ন

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

রাষ্ট্র হিসেবে ভারত তার কৃষ্টি, সভ্যতা, ঐতিহ্য, নৈতিকতাকে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কর্তব্যকে যে পুরুষের মাধ্যমে রূপায়িত হতে দেখেছে আমাদের সভ্যতার ইতিহাসে তিনি আর কেউই নন, মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম। আজকের যে ভারতকে আমরা দেখি, যে অখণ্ড ভারতের ছবি আঁকি— তার প্রথম রূপকার কি রামচন্দ্র? যে ধীরতা ও সমসত্ত্বতা রামচন্দ্র প্রদর্শন করেছেন তা অবিচ্ছেদ্য ভারতীয়ত্ব। ভারতসন্ধানী অধ্যাপক শেল্ডন পোলক তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'Ramayana and Political Imagination in India'-তে অনেক কথা বলেছেন, যা অসম্পূর্ণ, কখনও কখনও ভুল। তিনি এবং তাঁরা বোঝেননি রামচন্দ্র এবং ভারতের নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন যোগকে। বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই রামচন্দ্র ও রামায়ণের ব্যাখ্যায় রবি ঠাকুর পেয়েছিলেন এক নিষ্কলঙ্ক ভারতীয়ত্বের আস্বাদ। কবি লিখেছেন, ''যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা— সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও ঋণ কোনোকালে পরিশোধ হইবার নহে। তাঁহাদের পরিচয় বিলুপ্ত হইলে, তাঁহাদের উপদেশ বিস্মৃত হইলে মানবসভ্যতা আপন ধূলিধূমসমাকীর্ণ কারখানাঘরের জনতা মধ্যে নিশ্বাসকলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া কৃশ হইয়া মরিতে থাকিবে। রামায়ণ সেই অখণ্ড-অমৃত-পিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পতিব্রত, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানা- ঘরের বাতায়ন-মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।''

রামচন্দ্র চরিত্রে শৌর্যে বীর্যে ন্যায়ে ত্যাগে ভক্তিতে সেই মহাসমুদ্রের ঠিকানা দিয়েছেন— যা ভারত কল্পনার আদর্শ চিত্রবাহী। রাজধর্ম গার্হস্থ্যধর্ম একযোগে যা ভারতের চিরন্তন সাধনা তার রূপলেখা জেগে ওঠে একটি মাত্র চরিত্রে— রামচন্দ্র। একজন পুরুষের মধ্যে রমণীয়তা ও সৌভ্রাত্রের মেদুরতা আমাদের দেশ ব্যতীত আর কোথাও কি পূজিত হয়? সেই রূপ তরণীও রামচন্দ্র। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য--- এই তো আমাদের ভারতবর্ষ। রামচন্দ্র এমন এক চরিত্র যে বাল্মীকিতে আবদ্ধ থাকেননি। এ কে রামানুজন তাঁর Three Hundred Ramayanas : Five Examples and Three thoughts on Translation প্রবন্ধে দেখিয়েছেন প্রতি একজন আঞ্চলিক রামচন্দ্র চরিত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রামায়ণ জন্ম নিয়েছে। আন্নামী, বাংলা, তিব্বতি, থাই, বালি, কম্বোডিয়া, সংস্কৃত, সাঁওতালি, সিঙ্ঘলি, তামিল, তেলুগু আরও কত শত ভাষায় এবং লৌকিক রূপে এক ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্র হয়েছেন রাম। ভারত এবং বৃহত্তর ভারতের আদর্শ চরিত্র জাতিকে আবদ্ধ রেখেছে। সমন্বয় ও সদ্ভাব যদি ভারতের আদর্শ হয় তবে তার প্রয়োগ হয়েছে রাম চরিত্রের মধ্যেই। রামচন্দ্র অখণ্ড ভারত হিসেবে ভৌগোলিক রূপকোণের দর্শন দিয়েছেন— জনকপুরী (যা আজ নেপালে) থেকে অযোধ্যা, অযোধ্যা হয়ে প্রয়াগ— যা অতিক্রম করে রাম-লক্ষ্মণ বনবাস শুরু করেন। সেখান থেকে চিত্রকূট, তারপর দণ্ডকারণ্য (যা আজকের ছত্তিশগড় ওড়িশা মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যবর্তী সম্মিলিত অংশ), কিষ্কিন্ধা (যা আজকের হাম্পি), তুঙ্গভদ্রার তীরে রামের অরণ্যকাণ্ড এবং কিষ্কিন্ধা কাণ্ড, রামচন্দ্র যাত্রা করলেন পঞ্চবটীতে (বর্তমানে নাসিক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল)। এখান থেকে সীতাহরণ, অযোধ্যা থেকে ২৭০০ কিলোমিটার দূরের রামেশ্বরম রামচন্দ্রের পদাঙ্কিত, অন্ধ্রপ্রদেশের লেপাক্ষি, যেখানে রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ চলেছিল। তারপর সিংহল, আসমুদ্রহিমাচলের সঙ্গে রামচন্দ্রের পরিভ্রমণে পরিচয় হয়। ভূ-রাজনৈতিক ভারতবর্ষের সঙ্গে রামায়ণ আমাদের পরিচয় করানোর দায়িত্ব নেয়।

সুভাষচন্দ্র বসু যখন কটক থেকে তাঁর জননী প্রভাবতী দেবীকে পত্র লিখছেন— 'দাক্ষিণাত্যে দেখি স্বচ্ছ সলিলা পুণ্যতোয়া গোদাবরী। কী পবিত্র নদী। দেখিবামাত্র ভাবিবামাত্র রামায়ণে পঞ্চবটীর কথা মনে পড়ে। তখন মানস নেত্রে দেখি সেই তিনজন— রাম-সীতা-লক্ষ্মণ। সমস্ত রাজ্য ও সম্পদ ত্যাগ করিয়া সুখে, মহাসুখে, স্বর্গীয় সুখের সহিত গোদাবরীর তীরে কালহরণ করিতেছেন।' ত্যাগের পবিত্রতা ও শক্তির সন্ধান ভারতীয় দর্শনবোধে বারে বারে উল্লেখ রয়েছে— যার আদর্শ রূপকার শ্রীরামচন্দ্র। কখনও কখনও মনে হয় সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ এঁরা যাঁরা সবাই জাতীয়তাবোধের খাতিরে সবটুকু স্ব-সুখের মায়া ত্যাগ করেছিলেন তাঁরা সবাই যেন কোথাও না কোথাও রামায়ণ এবং রাম চরিত্রে জারিত, উদ্বুদ্ধ। ভারতকে চিনতে হলে রামায়ণ ও রামচন্দ্রের চরিত্রকে উপলব্ধি করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় রামচন্দ্র বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে, 'রাম ও সীতা ভারতবাসীর আদর্শ।' ভারতের

রামচন্দ্র ও ভারতীয়ত্ব একরৈখিক ও অবিচ্ছিন্ন এবং উভয়েই বহুত্ববোধের প্রতীক। ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল ও কর্তব্যপরয়ণ ভারত মানে তা রামচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত আর কিছুই না।

প্রতিটা ধূলিকণাতে জ্ঞানে অজ্ঞানে রামচন্দ্র অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছেন। কেন তিনি মর্যাদা পুরুষ? না, এই মর্যাদা মানে সম্মান (respect) নয়, এ মর্যাদার অর্থ সীমা লঙ্ঘন না করা। ভগবদ্ গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করেছেন, 'দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম'। তাই সহস্ররূপে রাম আসুক, যিনি পুরুষোত্তম, যিনি ধর্মের প্রতীক, ধর্মরাজ্য স্থাপনের দৃঢ় সংকল্পে যে সব সংকটে অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র যেন এই আদর্শে একযোগে পূজিত। যাকে ছাড়া ভারত-কল্পনা শুরু হয় না। তিনি ভারতীয়ত্বকে আত্মস্থ করেছেন স্ব আচরণে। কখনও মর্যাদা (সীমা/limit) চ্যুত হননি। কৈকেয়ী বলেন সমুদ্রের প্রতিজ্ঞা আছে সেও মর্যাদার লঙ্ঘন করে না।

'সরিতাংতু পতিঃ স্বল্পাং মর্যাদাং সত্যমন্বিতঃ।
সত্যানুরোধাৎ সময়ে বেলাং স্বাং নাতিবর্ততে।।'

রামচন্দ্র সে আদর্শ আদেশ পালন করেছেন— যেখানে ইন্দ্রিয়বৃত্তির মধ্যে মন ও মেধার সীমানা তিনি বুঝতে পারেন। শৃঙ্খলা ও ধর্মের সীমা যিনি কিছুতেই অতিক্রম করেন না। তাই হাসতে হাসতে পিতৃআজ্ঞা পালন করেন। তিনি সত্যভঙ্গ করেননি কখনও, তাই আদর্শ পুত্র, বন্ধু সুগ্রীবের জন্য বাধ্য হয়ে বালীকে বধ করেছেন, তিনি আদর্শ বীর, তিনি এক পত্নীব্রত, 'প্রজা সুখেই রাজার সুখ/ প্রজার হিতেই রাজার হিত' ধর্মের পালক— অখণ্ড ভারতীয় আদর্শ রামচন্দ্র।

শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবে, কিন্তু রামচন্দ্রের রেশ বিন্দুমাত্র শুষ্ক হবে না। উল্লেখ্য, রামচন্দ্র প্রসঙ্গে অনেকেই উত্তরাকাণ্ডের শম্বুক হত্যার প্রসঙ্গ এনে তাঁর চরিত্র কালিমালিপ্ত করেন। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড অনেকটাই প্রক্ষিপ্ত। শম্বুক বধও এক প্রক্ষিপ্ত কাহিনি। রামায়ণের বালকাণ্ডে ১ম এবং ৩য় সর্গে যে সূচিপত্র রয়েছে যা নারদ মুখে বর্ণিত যেখানে শম্বুক বধের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। অর্থাৎ তা পরে সংযোজিত। রামচন্দ্র সেই জাতপাত হীন ভারতের জনক যিনি শূদ্র কুলোদ্ভূত শবরীর মুখের এঁটো ফল খেয়েছেন। রামচন্দ্রের নিকট বান্ধব শূদ্র রাজা নিষাদ। একাত্মবোধের প্রতীক রামচন্দ্র যা জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও উদ্দেশ্য। বহু ক্ষেত্রেই সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের দুষ্টবুদ্ধিতে রামচরিত্রের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতকরণ হয়েছে যা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। যে উপনিষদ সব মানুষকে সমান চোখে দেখতে বলে তার সাধনা করেছিলেন রামচন্দ্র। হনুমানকুলকে নিজের কাছে রাখা, বন্ধুত্ব স্থাপন এতো সাম্যবাদের মডেল। জাতপাত ভেদাভেদ না রাখা এক মানব-দরদি সমাজের রূপ। যেখানে প্রতিটা কাঠবেড়ালিও কাজ করছে— অবিরাম শ্রম বণ্টনের জনক রামচন্দ্র। সবাই মিলে কাজ করলে শ্রম দান করলে, তবেই উন্নতির সেতু গড়ে ওঠে— সাফল্যের রামসেতু যেন তারই প্রতীকবাহী।

বৈদিক সাম্যবাদ সব ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে এক এমন সমাজ গঠনের মন্ত্র দেয় যেখানে সব জাতিগোষ্ঠী যেন শাশ্বত প্রেরণায় জীবনবোধে, সহিষ্ণুতার আবদ্ধ থাকার শিক্ষা পায়। অনেক সামাজিক উত্থান-পতন আমাদের এই মাটিতে হয়েছে। জাতপাত ভেদাভেদ এসেছে। তাই যদি প্রকৃত ভেদহীন ভারত পরিকল্পনা করতে হয় তখনও আদর্শ হবেন রামচন্দ্র এবং তাঁর সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ। অরণ্যকাণ্ডে রামচন্দ্র বলছেন—

'ধর্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্মাৎ প্রভবতে সুখম্।
ধর্মেণ লভতে সর্বং ধর্মসারমিদং জগৎ।।'

অর্থাৎ ধর্ম পালনেই সব সুখ আসে। তার দ্বারাই সব অভিষ্ট বস্তুর সন্ধান মেলে। কেন ভারতবাসীর জন্য, ভারতের জন্য রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হতে হয় বারবার? জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম রক্ষক মাটি যদি ভারত হয় তবে তার পালক রাম। মহর্ষি নারদ বাল্মীকিকে বলেছিলেন, 'শ্রীরাম নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবিখ্যাত এক নরপতি আছেন। তাঁর বাহু যুগল আজানুলম্বিত, স্কন্ধ অতি উন্নত, গ্রীবাদেশ রেখাত্রয়ে অঙ্কিত, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, মস্তক সুগঠিত, ললাট অতি সুন্দর, নেত্র আকর্ণ বিস্তৃত ও গাত্রবরণ স্নিগ্ধ। তিনি নাতি দীর্ঘ ও নাতি হ্রস্ব; তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রমাণারূপও বিরল। সেই সর্বসুলক্ষণ সম্পন্ন সর্বাঙ্গসুন্দর মহাবীর শ্রীরাম অতিশয় বুদ্ধিমান ও সদ্‌বক্তা। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীত ও নীতিপরায়ণ, তাঁর চরিত্র অতি পবিত্র, তিনি যশস্বী, জ্ঞানবান, সমাধিসম্পন্ন, সকল জীবের প্রতিপালক এবং সর্বোপরি স্বধর্মের রক্ষক। তিনি আত্মীয়স্বজন সকলকেই রক্ষা করছেন। তিনি প্রজাপতি সদৃশ ও শত্রুনাশক। তিনি শরণাপন্নদের সর্বদা আশ্রয় দেন। তিনি বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী। ধনুর্বিদ্যাবিশারদ, মহাবীর্যশালী, ধৈর্যশীল ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি বেদাদি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ প্রতিভাসম্পন্ন ও স্মৃতিশক্তি যুক্ত। সকলেই তাঁর প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করে থাকে। তিনি অতি বিচক্ষণ, সদাশয় ও তেজস্বী। নদীগুলি যেমন মহাসাগরকে সেবা করে, সেইরূপ সাধুগণ সততই তাঁর সেবা করে থাকে। তিনি শত্রু-মিত্রের প্রতি সমদর্শী এবং অতিশয় প্রিয়দর্শন। সেই কৌশল্যাগর্ভসম্ভূত লোকপূজিত রাম গাম্ভীর্যে সমুদ্রের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায় এবং সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায় কীর্তিত হয়ে থাকেন। এ সকল গুণের আধার যিনি তিনিই হলেন অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র।' তাই আমরা ভারতবাসী যখনই রূপে, গুণে, চরিত্রে, আদর্শের সন্ধান করি উপমা দিই, তখনই রাম উপস্থিত। রামচন্দ্র লঙ্কাদহন করলেন— কোথাও গিয়ে মনে হয় এ ছিল অর্ধমের দহন এ নিছক বাহুযুদ্ধ নয়। এবং ভারত আজকে যে ভাবে তার বিচারবোধ এবং মনস্তাত্ত্বিক সামাজিক ঐতিহ্যের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করছে— রামচন্দ্র তার প্রণেতা। সেই সফট পাওয়ারের স্রষ্টা রামচন্দ্র। যিনি সমুদ্র টপকে লঙ্কায় বিস্তার করেন। কিন্তু থাকলেন না তো লঙ্কাতে। তখন রামচন্দ্রের থেকে আমাদের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম শিখতে হয়। লক্ষ্মণ জয় করা লঙ্কায় দাদাকে থাকতে বললে, রাম হীরকময় দীপ্তিতে বলেন—

'অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে লক্ষ্মণ রোচতে।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।।'

তাই যদি শুভশক্তির আধারনা করতে হয়, এদেশে রামরাজত্ব স্থাপন করতে হয় তবে ভারতের প্রতিটি মৃত্তিকায় রামচরিতমানস রচনা করতে হবে।

রামচন্দ্র ও ভারতীয়ত্ব একরৈখিক ও অবিচ্ছিন্ন এবং উভয়েই বহুত্ববোধের প্রতীক। ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল ও কর্তব্যপরায়ণ ভারত মানে তা রামচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত আর কিছুই না। □

রামায়ণের যুগে অর্থনৈতিক কর্মধারা হিন্দু অর্থনীতির ধারা পথেই চালিত হতো, যা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল কম-বেশি গুপ্তযুগ পর্যন্ত।

ত্রিবর্গের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামায়ণের যুগের অর্থনীতি

ড. অনিল ঘোষ

পুরুষোত্তম শ্রীরামের অয়ন বা যাত্রাপথের বিবরণ হলো রামায়ণ। আদি কবি বাল্মীকির লেখা রামায়ণ সেই বিবরণই দিয়ে থাকে। শ্রীরামের জন্ম থেকে তার বনবাস অন্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, রাজ্যাভিষেক ও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত শ্রীরামের যাত্রাপথের বিবরণ যা বাল্মীকি রামায়ণের উপজীব্য। পণ্ডিতদের মতে বালকাণ্ডের প্রথম দিককার কয়েকটি শ্লোক এবং সপ্তম কাণ্ড বা উত্তরকাণ্ড পরবর্তীকালে রামায়ণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত । সে যাই হোক, আমাদের আলোচনা সে বিষয়ে নয়, আমরা আলোচনা করতে চাই রামায়ণের যুগের অর্থনীতি কীরূপ ছিল বা সে সময়কার অর্থনৈতিক ভাবনা কীরূপ ছিল সে বিষয় নিয়ে।

প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি :

ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রে মানুষের জীবনের চারটি লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হলো— ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারটি বর্গকে একত্রে পুরুষার্থ বা চতুর্বর্গও বলা হয়। এদের মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম— এই তিন লক্ষ্য বা ত্রিবর্গকে সমাজ জীবনের অর্জিতব্য লক্ষ্য বলা হয়ে থাকে। এই তিনটির সঙ্গে মোক্ষ একান্তভাবেই ব্যক্তি জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ত্রিবর্গই হলো হিন্দু অর্থনীতির মূল ভিত্তি স্বরূপ।

বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের ১০০তম সর্গে শ্রীরাম ও ভরতের সাক্ষাৎ এবং ভরতকে রামের পরামর্শ দেবার কথা বলা হয়েছে। ভরত এসেছিলেন শ্রীরামকে চিত্রকূট পর্বত থেকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু শ্রীরাম পিতৃসত্য পালন না করে অযোধ্যা ফিরবেন না বলে ভরতকে জানিয়েছিলেন এবং রাজ্য শাসনের কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই সর্গে ৬২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে—

কচ্চিদর্থেন বা ধর্মমর্থং ধর্মেণ বা পুনঃ।
উভৌ বা প্রীতিলোভেন কামেন চ ন বিবাধসে।।(২।১০০।৬২)

আমি বিশ্বাস করি যে তুমি নিশ্চয় ধর্মের সঙ্গে অর্থের বা উন্নতির অথবা উন্নতির সঙ্গে ধর্মের অথবা ইন্দ্রিয় প্রীতিলোভের জন্য ধর্ম ও অর্থের সঙ্গে আপোশ করবে না। আবার ওই একই সর্গের ৬৩নং শ্লোকে বলা হয়েছে :

কচ্চিদর্থং চ কামং চ ধর্মং চ জয়তাং বর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সর্বান্‌বরদ সেবসে।। (২।১০০।৬৩)

যাঁরা জয়ীদের মধ্যে সেরা, যথাসময়ে কাজ করার দক্ষ, তাঁরা এই বরগুলি পেয়ে থাকেন, তুমি তাদের মধ্যে অন্যতম। আমি বিশ্বাস করি তুমি যথাযোগ্য সময় দেবে ধর্ম, অর্থ, কাম— জীবনের এই তিনটি লক্ষ্য পূরণের জন্য। অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গে ২২নং শ্লোকে রাজা দশরথ শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের প্রাক্কালে ঋষি বশিষ্ঠ-সহ সকল ব্রাহ্মণ ও অমাত্যদের সামনে পুত্র শ্রীরামের নানা গুণের বিবরণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন—

ধর্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভাবান্।
লৌকিকে সময়াচারে কৃতকল্পো বিশারদঃ।। (২-১-২২)

পুত্র শ্রীরাম জানেন ধর্ম, অর্থ ও কামের সঠিক রূপ কী। খুব ভালো স্মৃতিশক্তি, সাবলীল প্রজ্ঞা, সামাজিক আচরণ ও প্রথা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার দক্ষতা— সবকিছুই তার মধ্যে বিদ্যমান।

এই শ্লোকগুলিতে প্রতীয়মান হয় যে সেসময় রাজ্য শাসনের কালে সামাজিক কল্যাণে রাজা এই ত্রিবর্গের উপরে গুরুত্ব দিতেন। এই কারণে ভরতকে শ্রীরাম এই ত্রিবর্গের প্রতি মনোযোগী হবার পরামর্শ দেন। রামায়ণ-যুগের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল এই ত্রিবর্গ, যেখানে অর্থ ও কামনানির্ভর কাজের ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি ও পথপ্রদর্শক ছিল ধর্ম। এই প্রসঙ্গে চাণক্য শ্লোকের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে বলা হয়েছে :

সুখসা মূলং ধর্মঃ ধর্মস্য মূলং অর্থঃ, অর্থস্য মূলং রাজ্যং রাজ্যসা মূলং 'ইন্দ্রিয়জয়ঃ' ইন্দ্রিয়জয়স্য মূলং বিনয়ঃ বিনযসা মূলঃ বৃদ্ধপোসেব্য। একই ভাবনা আমরা রামায়ণেও দেখতে পাই। অযোধ্যা কাণ্ডের ১০০তম সর্গের ৬১নং শ্লোকে বলা হয়েছে :

কচ্চিদ্‌গুরুংশ্চ বৃদ্ধাশ্চ তাপসান্ দেবতাতিথীন্।
চৈত্যাংশ্চ সর্বাংসিদ্ধার্থান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যসি।। (২।১০০।১১)

শ্রীরাম ভরতকে বলছেন, আমি বিশ্বাস করি যে তুমি শ্রদ্ধা, নমস্কার এবং যথাযোগ্য সম্মান করবে গুরু, বৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অতিথি, সন্ত এবং সর্বসিদ্ধ ব্রাহ্মণকে। তাই দেখি জনপদের যুগে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যেও বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ মানুষকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো।

মনে রাখা দরকার, হিন্দু অর্থনীতি হলো নীতিভিত্তিক যেখানে অর্থনীতির পাশাপাশি সমাজনীতি, রাজনীতি, ন্যায় ও দণ্ডনীতির কথাও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ভরত যখন শ্রীরামকে চিত্রকূট থেকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না তখন দাদার প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য শাসন করার জন্য দাদার কাছ থেকে যে পরমর্শগুলি পেয়েছিলেন, তার মধ্যে যেমন সামাজিক নীতির কথা আছে তেমনি ন্যায়নীতির কথা এবং অর্থনীতির কথাও আছে, যা সার্বিকভাবে রাজ্যশাসনের নীতি হিসেবেই পরিচিত। ধর্ম এখানে সবার উপরে স্থান পেয়েছে, ভিত্তি হিসেবে। পিতৃসত্য পালন তাঁর জীবনের ধর্ম, তাই তিনি সেই ধর্ম রক্ষা করার ব্রত পালনে বদ্ধপরিকর। তিনি বুঝেছিলেন— ধর্মের জন্য সবকিছুই ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোনো কিছুর জন্য ধর্মকে ত্যাগ করা যায় না। তাই আমরা দেখি, রাজকুমার ভরতের আবেদনকে স্বীকৃতি দিয়ে, বাবা দশরথের মন্ত্রীসভার প্রধান অমাত্য বশিষ্ঠমুনি যখন তাঁকে অযোধ্যায় ফিরে যাবার কথা বলেন সে কথাকেও শ্রীরাম সবিনয়ে ফিরিয়ে দেন এবং তিনি তাঁর ধর্ম রক্ষায় দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। নাস্তিক্যবাদী জবালি মুনির কথায় রেগেও গিয়েছিলেন শ্রীরাম। পরে বশিষ্ঠমুনির মধ্যস্থতায় তাঁকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়।

কৃষি ও কৃষি অনুযজ্ঞ ক্ষেত্র :

প্রজাকল্যাণ রাজার ধর্ম। এই ধর্ম পালনে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কর্মী যারা থাকেন তাদের প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কৃষি, শিল্প কাজ ও সেবামূলক কাজে যারা নিয়োজিত তাদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ না দিলে বা তাদের প্রাপ্য পাওনা যথা সময়ে যথাযথ ভাবে প্রদান না করলে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন তথা আয় অর্জন বাধাপ্রাপ্ত হয়। এজন্য শ্রীরাম ভরতকে পরামর্শ দিয়ে বলছেন :

কচ্চিতে দয়িতাঃ সর্বে কৃষিগৌরক্ষজীবিনঃ।
বার্তায়াং সংশ্রিতস্তাত লোকো হিং সুখমেধতে।।(২-১০০-৪৭)

শ্রীরাম বলছেন— আমি বিশ্বাস করি যারা কৃষিকাজ ও গোরক্ষা করে জীবিকা অর্জন করে তারা তোমার কাছে প্রিয়। তাই বিশ্বের অর্থ বা সমৃদ্ধি তৈরি হয় গোপালন বৃত্তির উপরে নির্ভর করে। এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার, আমরা যে সময়কার কথা আলোচনা করছি সেটা ছিল আজ থেকে প্রায় ৭০০০ বছর আগের কথা যা ইতিহাসের ধারায় অরণ্যসভ্যতার কথা, যখন গবাদি পশু ছিল অন্যতম প্রধান সম্পদ। এসময় গ্রামভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষি ও গোসম্পদ।

শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য :

কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি শিল্প কাজেরও উল্লেখ পাওয়া যায় রামায়ণের মধ্যে। শিল্পকাজ ছিল এবং শিল্পীদের শিল্পকাজের উৎকর্ষতার জন্য সমাজে তাদের সমাদরও ছিল। কৃষি ও শিল্প কাজের অভ্যন্তরীণ অথবা বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়টিও ছিল। বাণিকদেরও সমাজে বেশ সমাদর ছিল। শিল্পীদের প্রসঙ্গে ভরতকে পরামর্শ দিতে গিয়ে শ্রীরাম বলেছেন—

কচ্চিদ্ দুর্গাণি সর্বাণি ধনধান্যায়ুধোদকৈঃ।
যন্ত্রৈশ্চ প্রতিপূর্ণানি তথা শিল্পিধনুর্ধরৈঃ।। (২-১০০-৫৩)

আশা করি তোমার দুর্গ— অর্থ, শস্য, তন্ত্রে, জল ও যন্ত্রপাতি সেইসঙ্গে শিল্পী ও ধনুর্ধরে পূর্ণ আছে। রামের রাজ্যাভিষেকের সময়ে কারা কারা সেই অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন সে সম্পর্কে বলতে গিয়েও শিল্পী ও বণিকদের কথা বলা হয়েছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন দু'বার হয়েছিল। প্রথমবার শ্রীরামের বনবাসের আগে, দশরথের জীবিত অবস্থায় যা অসম্পূর্ণ থেকে যায় পিতৃসত্য পালনে শ্রীরামের বনবাস গমনের সংকল্পে এবং

দ্বিতীয়বার বনবাস অন্তে অযোধ্যায় ফিরে আসার পর। শ্রীরাম বনবাস অন্তে অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশের আগে নন্দীগ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে শ্রীরামকে অভ্যর্থনা জানানোর সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে—

কৈকেয়্যা সহিতাঃ সর্বা নন্দীগ্রামমুপাগমন্।
দ্বিজাতিমুখ্যৈর্ধর্মাত্মা শ্রেণীমুখ্যৈঃ সনৈগমৈঃ।। (৬-১২৭-১৬)

শ্রীরামের প্রত্যাবর্তনে অভ্যর্থনা জানানোর সময় (ভরত শ্রীরামের খড়ম মাথায় করে) অগ্রগণ্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের গিল্ড প্রধান (শ্রেণী মুখ্য), বণিক-সহ, কৈকেয়ী-সহ সকলে নন্দীগ্রামে উপস্থিত হলেন। অযোধ্যাকাণ্ডের ১০০তম সর্গের ৫৩নং শ্লোক এবং যুদ্ধকাণ্ডের ১২৭নং সর্গের ১৬নং শ্লোক থেকে জানা যায় যে রামায়ণের সময়কালে শিল্পী কারিগরেরা সমাজে এখন এক মর্যাদার স্থানে ছিল যে জন্য রাজার অভিষেক অথবা রাজাকে অভ্যর্থনা জানানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়েও তাঁরা স্থান পেতেন। পুগা, শ্রেণী— এই সব ছিলেন তখনকার দিনে গিল্ডের নাম। আজকের দিনের সমবায় সমিতির মতো। যুদ্ধকাণ্ডের ১২৮ সর্গে ৬৩নং শ্লোকে প্রকৃত পট্টাভিষেকের সময়ে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধে অন্যান্যদের সঙ্গে বণিক সম্প্রদায় উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকার ঔষধি লতাপাতা শ্রীরামের প্রতি বর্ষণ করছিলেন।

যোধৈশ্চৈ বাভ্যষি সিঞ্চনস্তে সম্প্রহৃষ্টাঃ সনৈগমৈ।
সর্বোষধিরসৈশ্চাপি দৈবতৈর্নভসি স্থিতৈঃ।। (৬।১২৮।৬৩)

যোদ্ধাদের সঙ্গে ব্যাপারিরা সকল প্রকার ঔষধি ও জড়িবুটির রস সিঞ্চন করতে থাকল। ব্যাপারী বা ব্যবসাদারদের প্রতি সামাজিক স্থিতি কীরকম ছিল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই শ্লোকটি। খাদ্য সংগ্রাহকের যুগ থেকে খাদ্য উৎপাদকের যুগে প্রবেশ করেও শিল্প উৎপাদন ও বিপণনে যে সমৃদ্ধ হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজবৈভব বিষয়ে বিবরণের মধ্যে।

কর ব্যবস্থা ও রাজকোষের অবস্থা :

রামায়ণ যুগেও কর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রজারা তাদের উৎপাদনের বা তাদের অর্জিত আয়ের ৬ ভাগের এক ভাগ রাজাকে কর হিসেবে প্রদান করত। লক্ষ্যণীয়, এই ১/৬ অংশ কর প্রদানের নীতি দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। মহাভারতের যুগে এবং জনপদের যুগেও এই হারে কর আরোপের কথা জানা যায়।

বলি ষড়্ ভাগম্ উদ্ধৃত্য নৃপস্য অরক্ষতঃ প্রজাঃ।
অধর্মঃ যো অস্য সো অস্য যস্যঅস্তর্য্যা অনুমতে গতঃ।।
(২-৭৫-২৫)

যারা পরামর্শ দেয় আমার মহান ভাইকে নির্বাসনে যাবার, তাদেরও সেইভাবে অধর্ম (পাপ) স্পর্শ করুক যেমনভাবে একজন রাজা প্রজাদের কাছ থেকে তাদের আয়ের ৬ ভাগের একভাগ নিয়ে তাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে অধর্ম করে। ভরত তার প্রিয় ভ্রাতা শ্রীরামের নির্বাসন সহ্য করতে না পেরে কুপিত হয়ে এই কথা বলেছেন তবু এর মধ্য দিয়ে সে সময়কার কর ব্যবস্থার একটা ছবি তিনি তুলে ধরেছেন। প্রজাদের কাছ থেকে তাদের উৎপন্ন ফসলের বা আয়ের একের ছয় অংশ কর হিসেবে রাজা পেতেন। বলা বাহুল্য, এই শ্লোকের আগে ও পরে কয়েকটি শ্লোকে অন্যায়কারী মানুষের অন্যায় কাজের অধর্মকে তার ভাইয়ের নির্বাসন পরামর্শের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যা সে সময়কার রাজ্যশাসনের ন্যায়নীতির প্রতি ইঙ্গিত সূচিত করে।

অযোধ্যা নগরীতে শ্রীরামের পট্টাভিষেকের পরে যে পরিমাণ রত্ন, বিভিন্ন প্রাণী যেমন হস্তি, অশ্ব প্রভৃতি উপস্থিত অতিথি অভ্যাগত ও পরিজনদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল তা থেকে জানা যায় যে সে সময় অযোধ্যা নগরীর কী পরিমাণ বৈভব ছিল।

শ্রীরাম তাঁর রাজ্যাভিষেকের পর প্রথমে ব্রাহ্মণদের শত সহস্র অশ্ব ও গাভী (সদ্য বাছুর হয়েছে এমন) এবং একশত বলদ উপহার দিলেন। পুনরায় ব্রাহ্মণদের ৩০ কোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং আবরণ ও আভরণ দিলেন। সুগ্রীবকে দিলেন সুন্দর চ্যাপলেট বা রত্নখচিত মালা, বালীপুত্র অঙ্গদকে দিলেন ক্যাটস আই রত্নখচিত ব্রেসলেট,, সীতাকে দিলেন রত্নখোচিত মুক্তোর মালা, সীতা সেই মালা গলা থেকে খুলে অন্য কাউকে দিতে চাইলে রাম বললেন তুমি তেমন একজনকে দিতে পারো যার মধ্যে সর্বদায় রয়েছে ক্ষিপ্রতা, দৃঢ়তা, খ্যাতি, নিপুণতা বা দক্ষতা, নম্রতা, মিতব্যায়িতা, সাহস, পৌরুষ ও বুদ্ধিমত্তা। তখন সীতাদেবী সেই মালা হনুমানের গলায় পরিয়ে দিলেন। এরপর শ্রীরাম বানর ও অন্যান্যদের মধ্যে যারা প্রবীণ তাদের ও মূল্যবান আবরণ ও আভরণ দিলেন। এরপর বিভীষণ, সুগ্রীব হনুমান, জাম্বুমান এবং অসংখ্য বিখ্যাত বানরদের তাদের কাঙ্ক্ষিত উপহার প্রদান করলেন। তারা হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ আদায়ে ফিরে গেল। (যুদ্ধকাণ্ডের ১২৮ সর্গ ৭৪ থেকে ৮৭ শ্লোক পর্যন্ত দৃষ্টব্য)।

মনে রাখতে হবে রামায়ণ রামের পথযাত্রার বিবরণ, তার মধ্য থেকেই তৎকালীন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। একটা কথা বলে রাখা ভালো যে রামায়ণে উল্লেখিত অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ রাজপরিবারের পরিচয় যতখানি জ্ঞাপন করে ততখানি প্রজাসাধারণের নয়। তবে যুদ্ধকাণ্ডের ১২৮ তম সর্গের ৯৯ থেকে ১০৬ নং শ্লোকগুলিতে রামরাজ্যের বিবরণ যা রয়েছে তা থেকে প্রজাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পাশাপাশি নিরাপত্তা সূচক ব্যবস্থার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীরমের রাজত্বকালে— রাজ্যে কোনো স্বামীহারা শোকাতুর বিধবাকে দেখা যেত না, কারও কোনো অসুখ বিসুখ দেখা যেত না (যা উন্নত চিকিৎসার ইঙ্গিত), হিংস্র বন্য পশুর আক্রমণের ভয় ছিল না, কোনো চোর, ডাকাত বা দুষ্কৃতকারী ছিল না (নিবিড় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ইঙ্গিত)। সকল প্রাণী সন্তুষ্ট ছিল, সকলেরই ধর্মে মতি ছিল, কারও মধ্যে কোনোরকম হিংসা, দ্বেষ ছিল না। গাছেরা নিয়মিত ফুল ও ফল দান করত, মেঘেরা বৃষ্টি দিত, মনোরম বায়ু বইত (পরিবেশ সচেতনা ও সুরক্ষা)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা নিজ নিজ কর্তব্য করত, সদ্‌গুণের অধিকারী হয়ে তারা ধর্মপথে চলত। এই বিবরণগুলি প্রজাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শান্তিপূর্ণ জীবনচর্যার ইঙ্গিত দেয়। এইভাবে দেখা যায় যে রামায়ণের যুগে অর্থনৈতিক কর্মধারা হিন্দু অর্থনীতির ধারা পথেই চালিত হতো, যা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল কম-বেশি গুপ্তযুগ পর্যন্ত। □

ভারতবাসীর কাছে শ্রীরামচন্দ্রের মতো প্রিয়তম কেউ নেই

গোপাল চক্রবর্তী

রামায়ণ রচনার আগে ঋষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— 'এমন মানুষ কে আছেন, যাঁর মধ্যে সমগ্র গুণলক্ষ্মী রূপ ধরেছেন?'

প্রশ্ন শুনে দেবর্ষি বলেছিলেন— 'এত গুণবান পুরুষতো দেবতাদের মধ্যেও দেখি না। তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাঁর কথা বলি শোন।'

দেবেস্বপিন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈরযুতম্।

শ্রুয়তাং তু গুণৈরেভির্যোযুক্তো নরচন্দ্রমাঃ।।

মর্যাদাপুরুষোত্তম্ শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকথা আপামর ভারতবাসীর হৃদয়ে পরম আদরে পরম ভালোবাসায় চিরকালের জন্য ঠাঁই করে নিয়েছে। ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বে শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে যত চর্চা, কাহিনি, কাব্য, সাহিত্য রচিত হয়েছে তা অন্যকোনো দেবতা কিংবা মানবকে নিয়ে হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে।

হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রামচন্দ্র ভূভার হরণার্থ নররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অথবা মানুষ রামচন্দ্র চরিত্র গৌরবে দেবত্বে উন্নীত হয়েছিলেন? উত্তরে বলা যায়, রামচন্দ্র মানুষ হলেও ভারতবাসীর হৃদয়ে দেবতা। আবার দেবতা হলেও তিনি রক্তমাংসের মানুষ। করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকথা ভারতবাসীর অন্তরে পরম আদরে পরম ভালোবাসায় চিরকালের জন্য ঠাঁই করে নিয়েছে।

'রামচরিতমানস'-এ গোস্বামী তুলসীদাস সুন্দরকাণ্ডে রাবণের কাছে বিভীষণকে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করিয়েছেন— 'সরন গএঁ প্রভু তাহু ন ত্যাগা। বিস্ব দ্রোহ কৃত অঘ জেহি লাগা।। জাসুনাম ত্রয় তাপ নসাবন। সোই প্রভু প্রগট সমুঝু জিয়ঁ রাবণ।। অর্থাৎ সর্বজগতের অকল্যাণকারী পাপীও যদি তাঁর শরণ গ্রহণ করে, প্রভু তাকেও ত্যাগ করেন না। যাঁর নাম উচ্চারণ মাত্র ত্রিতাপ নাশ হয়, সেই স্বয়ং ভগবান মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। হে রাবণ! আমার কথা অনুধাবন করো।'

রাক্ষসদের অত্যাচারে ঋষিদের তপস্যা বিঘ্নিত। এই রাক্ষসেরা ভয়াল রাক্ষসী তাড়কার অনুচর। মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই রাক্ষসদের বধ করে যজ্ঞস্থল নিরুপদ্রপ করার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে চলেছেন অরণ্য পথে। পুণ্যতোয়া নদীতে অবগাহন করে রাম উপবেশন করলেন মহর্ষির সমীপে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামকে বললেন— 'রাম আমার জীবনের সকল তপস্যা সকল সিদ্ধি আজ তোমাকে দান করব। 'বলা' ও 'অতি বলা' নামে দু'টি মন্ত্র তুমি গ্রহণ কর। এই মন্ত্রবলে তুমি কখনো শ্রম, জ্বর, পিপাসায় পীড়িত হবে না। তোমার মধ্যে কোনো বিকার আসবে না। তুমি নিদ্রিত অথবা অসাবধানে থাকলেও কোনো রাক্ষস তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। শৌর্যেবীর্যে, জ্ঞানে, দাক্ষিণ্যে, কর্মদক্ষতায়, কর্তব্য নির্ধারণে, বিচারে ও বাগ্মিতায় তোমার তুল্য কেউ হবে না। এই মন্ত্র নিখিল জ্ঞানের ও মঙ্গলের প্রসূতি। তুমিই এর উপযুক্ত আধার, তাই এই মন্ত্র তোমায় দিলাম।'

অযোধ্যা থেকে মিথিলা, দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। নানা রাজ্য, জাতি উপজাতি, নদ-নদী, বন-উপবন, মানুষের ভিন্নতর আর্থ-সামাজিক অবস্থা— বিশ্বামিত্র সব কিছুর সঙ্গে রামচন্দ্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটালেন। যা পরবর্তীকালে রামচন্দ্রের রাজ্য শাসনের অন্যতম প্রধান সহায়ক হয়েছিল।

তাড়কার মতো ভয়ংকর রাক্ষসীকে বধ করে রামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞস্থল নিরুপদ্রপ করলেন। বিশ্বামিত্র তখন রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে উপস্থিত হলেন মিথিলাধিপতি জনকের রাজসভায়। জনকের কাছে রক্ষিত হরধনু ভঙ্গ করলেন রামচন্দ্র। পিতা দশরথের উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি নিয়ে জনকনন্দিনী সীতার পাণিগ্রহণ করলেন। রাম-লক্ষ্মণ দীর্ঘদিন রাজধানী ছেড়ে এসেছেন, দশরথ দ্রুত নবদম্পতীদের নিয়ে অযোধ্যার পথে যাত্রা করেন। মাঝখানে মহাবিঘ্ন স্বরূপ উপস্থিত হলেন একুশবার ক্ষত্রিয় নিধনকারী পরশুরাম। রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করে পরশুরাম বললেন— 'তোমার বড়ো গর্ব, তুমি জীর্ণ হরধনু ভঙ্গ করেছ। হরধনুর চেয়েও ভয়ংকর আমার এই বৈষ্ণব ধনু। এতে শরসংযোজন করে তোমার বীরত্ব দেখাও। যদি সক্ষম হও তবে তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ

হয়ে তোমার বীরত্বের পরীক্ষা নেব।

সন্ত্রস্ত দশরথ করজোড়ে পরশুরামের স্তুতি করে তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। পরশুরাম দশরথের কথায় কর্ণপাত না করে পুনরায় রামচন্দ্রকে আহ্বান করলেন। শ্রীরাম বিনয়ের সঙ্গে বললেন—

—হে ভার্গব, আপনার কীর্তিগাথা আমি অবগত। কিন্তু আমার শক্তিকে আপনি অবজ্ঞা করবেন না।

এই কথা বলে পরশুরামের হাত থেকে ধনু গ্রহণ করে অক্লেশে তাতে গুণযোজনা ও শরসংযোগ করলেন। পরশুরাম হতবাক। শ্রীরাম আবার বললেন—

—হে ব্রাহ্মণ, আপনাকে বধ করে ব্রহ্মহত্যার পাপ আমি গ্রহণ করবো না। কিন্তু বৈষ্ণব ধনুঃশর অব্যর্থ, তাই আমি আপনার গতি শক্তি অথবা তপোবল বিনাশ করবো।

নিস্তেজ পরশুরাম করজোড়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—

—রাম, তুমি আমার ধনুগ্রহণ করা মাত্র বুঝেছি তুমি স্বয়ং নারায়ণ। তুমি শরনিক্ষেপ করে আমার তপোবল নষ্ট করে দাও, কিন্তু আমার গতিশক্তি স্তব্ধ করে দিয়ো না। তোমার কাছে পরাজয়ে আমার কোনো গ্লানি নেই। আমি মহেন্দ্র পর্বতে গমন করবো।

রামচন্দ্র শরমোচন করে পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। আবার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পৌঁছালেন অযোধ্যা নগরে। দশরথ ঘোষণা করলেন রামের রাজ্যাভিষেকের। কিন্তু কোথায় অভিষেক? কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে শ্রীরামকে যেতে হলো বনবাসে। কিন্তু রাম কি সহজে বনবাসে যেতে পারলেন? কৌশল্যা বিদ্রোহ করলেন, সঙ্গে লক্ষ্মণও। রাম অবিচল। পিতৃসত্য তিনি পালন করবেনই। লক্ষ্মণকে বললেন—

—ক্ষান্ত হও, লক্ষ্মণ। তুমি জানবে পিতার আদেশ পালন করাই আমার দৃঢ় সংকল্প। এই আমার সত্যপথ। 'পিত্রোর্বচনে ব্যবস্থিতং নিবোধ মানেষ হি সৌম্য সৎপথঃ'

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২৩।৪১)।

ভরত যখন শ্রীরামকে বনবাস থেকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিতে এসেছেন, কৈকেয়ীর কৃতকর্মের জন্য নিন্দা করছেন, তখন শ্রীরাম বলছেন— 'ভরত, তুমি মাতৃনিন্দা করো না। পিতা-মাতার কর্মের দোষ দেখতে নেই। পুত্রের প্রতি পিতা যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। তুমি আমি দু'জনেই পিতৃবাক্যে সত্যবদ্ধ। আমি যেমন পিতার বাক্য লঙ্ঘন করতে পারি না, তুমিও পার না। জানবে পিতার আদেশ সিংহাসন ত্যাগ ও বসনবাস। আমরা যদি সুপুত্র হই তবে তার অন্যথা যেমন তুমি করতে পার না, তেমনি আমিও করতে পারি না। তুমি ধর্মজ্ঞ পিতা-মাতার প্রতি গৌরব প্রদর্শন কর।

'যাবৎ পিতরি ধর্মজ্ঞ গৌরবং লোকসৎকৃতে।

তাবদ্ ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ জনন্যামপি গৌরবম্।।

(অযোধ্যাকাণ্ড ১০১/২৯)

সীতা হরণের পরে আমরা এক বিরহ বিহ্বল রামচন্দ্রকে দেখতে পাই। সীতা যে শ্রীরামের কত প্রিয়তমা তা অনুধাবন করা যায় তাঁরই একটা উক্তিতে— 'লক্ষ্মণ রূপে রসে গন্ধে ভরা এই বসন্তদিন আজ আমার কাছে নিষ্ফল। যদি এখন সীতার সঙ্গে এই দূর্বা কোমল রমণীয় স্থানে বিহার করতে পারতাম তাহলে অযোধ্যা কেন ইন্দ্রের অমরাবতীর অধিশ্বরও হতে চাইতাম না

(কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ১/৯৫-৯৬)।

কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীব হনুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং মিলন হলো শ্রীরামচন্দ্রের। শর্ত হলো, বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে রাজত্ব দিলে সুগ্রীব সমগ্র বানরবাহিনী নিয়ে সীতা উদ্ধারের জন্য রামকে সাহায্য করবেন। বালীবধ শ্রীরামের চরিত্রের একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু রামচন্দ্র কি সত্যিই বালীকে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করেছিলেন? বাল্মীকি রামায়ণ যে অন্য কথা বলে। আদিকাণ্ডের ১/৬৭-৬৮, ৭০ সংখ্যক শ্লোকের 'হত্বা বালিনমাহবে' কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ, আবার কিস্কিন্ধা কাণ্ডের ১৯/১১-১২ শ্লোকে—

'রাম সাক্ষাৎ শমনের মতো এসে বালীকে পরাভূত করেছেন। বালী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অজস্র শিলা ও বৃক্ষ সব বিদীর্ণ করে রাম বজ্রবাণে তাকে নিহত করেছেন।

রাবণ বধের পরে সীতা উদ্ধার হন। কিন্তু সীতা কি তাঁর যোগ্য মর্যাদা পেলেন? এই প্রশ্ন তো থেকেই যায়। অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করার পর রামচন্দ্র রাজধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের চেয়ে প্রজারঞ্জনই তাঁর প্রধান কর্তব্য। তাই বিনাদোষে তিনি সীতাকে নির্বাসন দেন। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তপস্বী শূদ্র শম্বুককে বধ করতে বাধ্য হন।

মহাকবি কালিদাস 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে সুন্দর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

উপস্থিতাং পূর্বমরাত্য লক্ষ্মীং বনং ময়া সার্ধংমসি প্রপন্নঃ।

তদাস্পদং প্রাপ্য

তয়াতিরোষাৎসোঢ়াস্মিন ত্বদ্ভবনে বসন্তী।।

(রঘুবংশ-১৪/৬৩)

'একদিন রাম রাজলক্ষ্মীকে হেলায় ত্যাগ করে, তাঁর প্রেমলক্ষ্মী সীতাকে নিয়ে বনে গিয়েছিলেন। এবার তাই অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী সেই উপেক্ষার প্রতিশোধ নিলেন সীতার উপর। রাম এবার সীতাকে ত্যাগ করে অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকেই বরণ করলেন।'

ভবভূতির উত্তররাম চরিতে আছে, শ্রীরাম যখন লক্ষ্মণকে সীতা নির্বাসনের নির্দেশ দেন তখন বলেছিলেন—

—তুমি এই আদেশকে রাজাদেশ বলে জানবে। স্নেহময় অগ্রজের বাক্য নয় রাজাদেশ যা অলঙ্ঘ্য।

উত্তরকাণ্ডে সারথী সুমন্ত্র কথিত এক কাহিনি থেকে জানা যায়। 'একবার দৈত্যরা দেবতাদের দ্বারা তাড়িত হয়ে ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করে। ভৃগুপত্নী দৈত্যদের অভয় দেন। বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হয়ে সুদর্শন চক্র দিয়ে ভৃগুপত্নীকে বধ করেন। পত্নীকে নিহত দেখে ভৃগু বিষ্ণুকে অভিশাপ দিয়ে বললেন— বিষ্ণু তোমাকেও মনুষ্য জন্ম নিতে হবে এবং বহুবর্ষ স্ত্রীবিচ্ছেদের দুঃখ সহ্য করতে হবে। অতএব রামসীতার বিচ্ছেদ ভবিতব্য।'

ভারতবাসীর কাছে অনেক পূজনীয় দেবতা আছেন কিন্তু রামচন্দ্রের মতো তাদের এমন প্রিয়তম কেউ নেই। শ্রীরাম ভারতবর্ষের প্রীতির কল্যাণের ভালোবাসার সত্যধৃতির মানুষী বিগ্রহ। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল মাধুরী। □

শ্রীরামচন্দ্র

দীনেশচন্দ্র সেন

রামচরিত্র বিশাল বনস্পতির ন্যায়— উহা ক্বচিৎ নমিত হইয়া ভূস্পর্শ করিলেও সেই অবনয়ন তাহার নভঃস্পর্শী গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করে না— পার্থিব জ্ঞাতিত্বের পরিচয় দিয়া আমদিগকে আশ্বস্ত করে মাত্র। রামচন্দ্র সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াই আপনার চরিত্রকে অপূর্ব্বশ্রীসমন্বিত রাখিয়াছেন— তাঁহার কোন চিন্তা বা কার্য্যই পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি হইতে উত্থিত নহে, এমনকি, বালীকেও তিনি কনিষ্ঠভ্রাতার ভার্য্যাপহারী দস্যু বলিয়া সত্য সত্য বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এইজন্যই দণ্ড দিতেও গিয়াছিলেন। সুগ্রীবের শত্রু তাঁহার শত্রু,— তাহাকে বধ করিতে তিনি অগ্নিসমক্ষে প্রতিশ্রুত ছিলেন— এই প্রতিশ্রুতি পালন তিনি ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উত্তরকাণ্ডবর্ণিত সীতা-বর্জ্জনেও দৃষ্ট হয়— রাম যাহা স্বকর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন--- তাঁহার জীবনকে সম্যক্‌রূপে নৈরাশ্যপূর্ণ করিয়াও তিনি তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এই ঘটনায়ও তাঁহার চরিত্রের সতেজ পৌরুষের দিক্‌টাই জাজ্বল্যমান করিয়াছে। মহাকাব্যের কোন গূঢ়দেশে অবস্থার দারুণ পীড়নে নিষ্পেষিত হইয়া তিনি দুই একটি অধীরবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া হট্টগোল করা এবং হিমালয়ের কোন্ শিলা কি পাদপে একটু ক্ষতচিহ্ন আছে, তাহা অবিষ্কার করিয়া পর্ব্বতরাজের মহত্ত্বকে তুচ্ছ করা, দুইই একবিধ। সাহিত্যিক ধূর্ত্তগণ রামচরিত্রের তদ্রূপ সমালোচনার ভার লইবেন। বাল্মীকি-অঙ্কিত রামচরিত্র অতিমাত্রায় জীবন্ত— এ চিত্রে সূচিকা বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যেন রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়— এই চরিত্র ছায়া কিংবা ধূম্রবিগ্রহে পরিণত হওয়া পুস্তকান্তর্গত আদর্শ হইয়া পড়ে নাই।

সঙ্গীতের ন্যায় মানবজীবনেরও একটা মূলরাগিণী আছে— গীতি যেরূপ নানারূপ আলাপচারিতে ঘুরিয়া ফিরিয়াও স্বীয় মূলরাগিণীর বাহিরে যাইয়া পড়ে না, মানবচরিত্রেরও সেইরূপ একটা স্বপরিচায়ক স্বাতন্ত্র্য আছে— সেইটিকে জীবনের মূলরাগিণী বলা যায়; জীবনের কার্য্যকলাপ সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে উহা আবিষ্কৃত হয়। যিনি যাহাই বলুন,— সেই অভিষেকোপযোগী বিশাল সম্ভারের প্রতি তাচ্ছিল্যের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া অভিষেকব্রতোজ্জ্বল শুদ্ধপট্টবস্ত্রধারী রামচন্দ্র যখন বলিয়াছিলেন—

"এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ।
জটাচীর ধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।।"

'তাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পালনপূর্ব্বক জটাবল্কল ধারণ করিয়া বনবাসী হইব'— সেই দিনের সেই চিত্রই রামের অমর চিত্র। এই অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের শ্রী তাঁহাকে চিনাইয়া দিবে। প্রজাগণ জলভারাচ্ছন্ন আকুল চক্ষে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—

"যা প্রীতির্বহুমানশ্চ ময়াযোধ্যানিবাসিনাম্।
মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষণ ভরতে সা বিধীয়তাম্।।"

'অযোধ্যাবাসিগণ', তোমাদের আমার প্রতি যে বহুমান ও প্রীতি, তাহা ভরতের প্রতি বিশেষভাবে অর্পণ করিলেই আমি প্রীত হইব।' এই উদার উক্তিই রামচরিত্রের পরিচায়ক। লক্ষ্মণের ক্রোধ ও বাগ্‌বিতণ্ডা পরাভূত করিয়া ঋষিবৎ সৌম্য রামচন্দ্র অভিষেকশালার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন—

"সৌমিত্রে যোঽভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ।
অভিষেকনিবৃত্তার্থে সোঽস্তু সম্ভারসম্ভ্রমঃ।"

'সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের জন্য যে সম্ভ্রম ও আয়োজন হইয়াছে, তাহা আমার অভিষেকনিবৃত্তির জন্য হউক।' এই বৈরাগ্যপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি সমস্ত ক্ষুদ্রস্বর পরাজিত করিয়া আমাদের কর্ণে বাজিতে থাকে। যেদিন রাবণ রামের শরাসনের তেজে ভ্রষ্টকুণ্ডল ও হতশ্রী হইয়া পলাইবার পন্থা পাইতেছিল না, সে দিন রামচন্দ্র ক্ষমাশীল গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন— 'রাক্ষস, তুমি আমার বহুসৈন্য নষ্ট করিয়া এখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, আমি ক্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করি না, তুমি আজ গৃহে যাইয়া বিশ্রাম কর, কল্য সবল হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও।" সেই মহাহবের মহতী প্রাঙ্গণভূমিতে ধার্ম্মিকপ্রবরের এই কণ্ঠস্বর স্বর্গীয় ক্ষমা উচ্চারণ করিয়াছিল;— উহাই তাঁহার চিরাভ্যস্ত কণ্ঠধ্বনি,— রাম ভিন্ন জগতে একথা শত্রুকে আর কে বলিতে পারিত? কৈকেয়ীকে লক্ষ্মণ প্রসঙ্গক্রমে নিন্দা করিলে রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন— "অম্বা কৈকেয়ীর নিন্দা তুমি আমার নিকট করিও না"--- এরূপ উদার উক্তি রামের মুখেই স্বাভাবিক; সীতাকেও তিনি এই ভাবে বলিয়াছিলেন—

"স্নেহপ্রণয়সম্ভোগে সমা হি মম মাতরঃ।"

"আমার প্রতি স্নেহ ও আদর প্রদর্শনের সম্পর্কে,— সকল মাতাই আমার পক্ষে তুল্য।" যে দিন শরাহত লক্ষ্মণ মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন, এদিকে দুর্দ্ধর্ষ রাবণ তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা পাইতেছিল—ব্যাঘ্রী যেরূপ স্বীয় শাবককে রক্ষা করে, রামচন্দ্র সেই ভাবে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতেছিলেন; রাবণের শরজাল তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ছিন্নিভিন্ন করিতেছিল, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া রামচন্দ্র সজলচক্ষে লক্ষ্মণকে বক্ষে লইয়া বসিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, —"তুমি যেরূপ বনে আমাকে অনুগমন করিয়াছ, আমিও আজ সেইরূপ মৃত্যুতে তোমাকে অনুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না।" ---এইরূপ শত শত চিত্র রামায়ণকাব্যে অমর হইয়া আছে, শত শত উক্তিতে সেই চিত্র রামায়ণকাব্যে অমর হইয়া আছে, শত শত উক্তিতে সেই চিত্র স্বর্গের আদর্শ পৃথিবীতে আঁকিয়া ফেলিতেছে, বহু পত্রে সেই চিত্র ও উক্তি আমাদিগকে এই আশ্চর্য্য চরিত্রের সমুন্নত সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মুগ্ধ ও বিস্ময়াভিভূত করিতেছে। রামায়ণ-কাব্যপাঠান্তে রামচন্দ্রের এই উজ্জ্বল ও সাধু মূর্ত্তি মানসপটে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া যায়, অপর কোনো কথা মনে উদয় হয় না, আর একান্ত সাত্ত্বিকভাবে বিচার করিলে সীতাবিরহে রামের প্রেমোন্মাদ যদি দৌর্ব্বল্যজ্ঞাপক হয়, তবে তাহার এই সান্ত্বনা যে, প্রণয়িগণের নিকট রামের এই প্রেমোন্মাদের ন্যায় মনোহর কিছু নাই— এখানে বৈরাগ্যের শ্রী নাই, কিন্তু অপর্য্যাপ্ত কাব্যশ্রী সে অভাব পূরণ করিয়া দিতেছে, আর নির্জ্জন গিরিপ্রদেশের শোভান্বিত দৃশ্যাবলীতে বিরহাশ্রুর সংযোগ করিয়া সেই সমস্ত বিচিত্র বাহ্যসম্পদ্ চিরসুন্দর করিয়া রাখিয়াছে।

('রামায়ণী কথার' রামচন্দ্রের শেষাংশ)
(বানান অপরিবর্তিত)

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনে মুখে কুলুপ এঁটেছেন সেকুলারিস্টরা

ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে একজন মুসলমান কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং প্রচার মাধ্যমগুলি হইহই করে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশে যে নিয়মিতভাবে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যাচারিত নির্যাতিত হচ্ছে এবং ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছে সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা নির্বিকার ভাবটা এই রকম, যে ওরকম তো কতই ঘটে, রহস্যটা কী? অতি আশ্চর্যের যে, এদের অনেকের পূর্বপুরুষরা পূর্বপাকিস্তানে বা বাংলাদেশে মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত হয়ে নিজেদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় একবস্ত্রে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে। ওঁরা সেসব বিস্মৃত হয়ে বামপন্থা অবলম্বনে ভেকধারী হয়েছেন। ওঁরা আবার বিভিন্ন মিছিলে স্লোগান দিয়ে থাকেন হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই, ভেদ নেই ভেদ নেই। আবার গানও ধরেন 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান'।

অতি আশ্চর্যের যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নীরব কেন? তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুসম্পর্ক রয়েছে। শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি প্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে যোগ দিয়েছিলেন। তাহলে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিষয়ে তিনি নীরবতা অবলম্বন করে রইলেন কেন? প্রশ্নটা কি অস্বাভাবিক কিছু?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
বড়বাজার, চন্দননগর।

হিন্দুদের স্বপ্ন

হিন্দুরা জিনগতভাবেই সহনশীল, উদার ও মননশীল হয়ে থাকে। এটি আমাদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় কিন্তু মাত্রাটা কম। হিন্দু কখনো হিংস্র নয়। পশুবৃত্তি এখানে অনেকটাই অনুপস্থিত। নির্মমতা, অমানবিকতা, অসহনশীলতা, অপরাধ প্রবণতা অন্যদের মধ্যে যেমন ক্রিয়া করে হিন্দুদের মধ্যে তার মাত্রা নগণ্য। প্রিয় পাঠকদের বলে রাখি, এই লেখাটি নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। কাউকে কষ্ট দেওয়া কিংবা হেয় করা আমার লেখার উদ্দেশ্য নয়। যিনি দ্বিমত পোষণ করবেন দয়া করে নিভৃতে একাকী নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

একমাত্র অতি প্রাচীন হিন্দু ধর্ম নিজের মধ্যে ধারণ করা তেমনটা সহজ নয়। হিন্দুরা পৃথিবীর সর্বত্র মার খায়, নির্যাতিত হয়, ধর্মান্তরে বাধ্য হয়, ধর্ষিত হিন্দু রমণী ধর্ষককে বিবাহে বাধ্য হয়, হিন্দুদের সম্পদ লুণ্ঠন করা পুণ্যের কাজ, সেটা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে হিন্দুদের সম্পদ কুক্ষিগত করা হচ্ছে, হিন্দুদের উপাসনালয়ে হামলা আজকে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এছাড়াও আরও বর্ণনাতীত বিষয় আছে যা লিপিবদ্ধ করে শেষ করা যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুসলমান শিক্ষক বলেছিলেন, 'মুসলমানদের যাবতীয় লুণ্ঠন প্রক্রিয়া বন্ধ করা গেলে, বাংলাদেশের তথাকথিত শিল্পপতি, আমলা, ব্যবসায়ী-সহ বহু রাঘব বোয়ালকে গামছা পরিধান করে গ্রামে যেতে হবে।' কথাটি অকাট্য সত্য, এবং সে কারণে তাকে নিগৃহীত করা হয়েছিল। আসলেও সেটি যে সত্য স্বীকার করবে কে। কেননা প্রায় সকলেই এর স্বাদ জিহ্বায় ধারণ করেই আছেন। সুতরাং নিজের বিরুদ্ধে কে যাবেন। যাক, আমি এটাও বলতে চাই না যে অন্য সব ধর্ম খারাপ। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই লিখলাম।

হিন্দুদের মনে একটা লালিত স্বপ্ন অনেক আগের। একটা হিন্দুদের ঘোষিত দেশ, হিন্দুদের বাসযোগ্য একটা ভূখণ্ড। হিন্দুদের মনে অনেকদিনের ক্ষত, এই ক্ষতের যন্ত্রণা লাঘবের নিমিত্তে একটা ঘোষিত ভূমি, একটা আলাদা মানচিত্র আজকে সময়ের দাবি। বাংলাদেশে মুসলমানরা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। অনৈতিক এ সাংবিধানিক চর্চা নীরবে অন্য ধর্মের লোকেরা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে। প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করার সরকারি আইনি অধিকার ও আশকারা আজকে বাংলাদেশের হিন্দুদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। ওয়াজের নামে প্রতিদিন হিন্দু এবং হিন্দুস্থানের বিরোধিতা করা এদের রুটিন মাফিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। হিন্দুদের ক্ষতি করাকে বাহাদুরি কাজের মর্যাদা দিয়েছে দেশটি। সরকারের তাই তাদের বিরুদ্ধে কোনোরকম ভূমিকা নেওয়ার যেমন সাহস নেই, তেমনি প্রয়োজনও মনে করে না। এইরূপ জঘন্য অবস্থায় আমরা শুধুই কলসীর কানায় কপাল ফাটাতে থাকবো?

হিন্দু সমাজের এ রক্তক্ষরণ এক সময়ে রক্তশূন্যতার সৃষ্টি করবে। আর রক্তশূন্যতায় একদিন মানুষটি প্রাণহীন কঙ্কালে পরিণত হতে বাধ্য। আমরা কোনোক্রমেই এই অবস্থার মুখোমুখি হতে চাই না। আমাদের ধর্ম, আদর্শ, আমাদের সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখতে এখন করণীয় হিন্দুদের দেশ ঘোষণার। সকল কিছুর ঊর্ধ্বে এই নৈতিক দাবি আজকে সময়ের দাবি। এ দাবি সকল কিছুকে ছাপিয়ে নিতে হবে। হিন্দুদের বিলুপ্ত করার গোপন ইচ্ছেকে হিন্দুদের মন্ত্রমোহ অঙ্গার করে দিতে হবে। আর এই মহান ও ঐতিহাসিক কাজের এটাই মোক্ষম সময়।

—সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী,
আগরতলা।

শি জিনপিং : চীনের মসনদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

সম্প্রতি চৈনিক সংসদ একরকম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শি জিনপিংকে চীনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছে। ৬৯ বয়সি শি জিনপিংকে কার্যত আমৃত্যু ওই পদে আসীন থাকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করল। প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি রাবার স্ট্যাম্পের মতো শি

জিনপিংকে ভোট দেয়। বিপক্ষে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কার্যত শি একসঙ্গে দল, সামরিক বাহিনী এবং দেশের একচ্ছত্র অধিপতি। অদূরে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ ময়দানে নামার সম্ভাবনা নেই। এক দশক আগে শি জিনপিং যখন ক্ষমতাসীন হন সেই সময় থেকেই স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেন। পাঁচ বছর আগে তিনি যখন ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করেন সেই সময় থেকেই তাঁর চলার পথ মসৃণ ছিল না। আমেরিকার সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্কে অবনতি, তাইওয়ান নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াই, ২০২২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যে লড়াই শুরু হয়, তাতে বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে এখন পর্যন্ত পুতিনের পাশে চীন। দেশে মানবাধিকার ভুলুণ্ঠিত। ভারতের চারপাশে যেসব প্রতিবেশী দেশ রয়েছে তার মধ্যে চীন আমাদের দুশমন নাম্বার ওয়ান। ২০২০ সাল থেকে শি জিনপিঙের চীন ভারতের সঙ্গে সীমানা নিয়ে লড়াই অব্যাহত রেখেছে। গালওয়ান উপত্যকায় চীনা সেনাদের ঔদ্ধত্য রুখতে গিয়ে কুড়িজন বীর সেনা বীরগতি লাভ করেছেন। একমাত্র চীনকে ঠেকাতে সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হয়েছে সরকারকে। আর এসব ঘটেছে এই শি জিনপিঙের আমলেই।

ঘরোয়াভাবে চৈনিক নাগরিকরা স্বস্তিতে নেই। একে মানবাধিকার লঙ্ঘিত, গত তিন বছর জিরো কোভিড পলিসি লাগু করতে গিয়ে সরকারের দমনপীড়ন নীতি, উপভোক্তাদের সরকারের ওপর আস্থা কমে যাওয়া, দুনিয়াজুড়ে চীনা দ্রব্যের রপ্তানি কম। গত বছরে চীনের আর্থিক বৃদ্ধি ঘটেছে মাত্র তিন শতাংশ। সংসদে চীন দেশকে আশ্বস্ত করেছে আগামী বছরে উন্নয়নের হার হবে ৫ শতাংশ।

ওয়াকিবহাল সূত্রের মতে, চীন যদি তার আর্থিক গতি বৃদ্ধি করতে চায় তবে শি-কে দলও বেসরকারি উদ্যোগে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে হবে এবং পশ্চিমি দেশগুলোর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। না হলে হয়তো জনরোষের মুখে পড়তে হতে পারে। ইউক্রেনের যুদ্ধের পর নিঃসঙ্গ পুতিনের ভরসাস্থল একমাত্র চীন। সেইজন্য শি-র তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যাভিষেকে আগাম বার্তা পাঠিয়েছেন পুতিন। দোসর শি জিনপিংকে বাহবা দিয়ে তাঁর আর্থ-সামাজিক নীতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। দুনিয়ার অন্য দেশগুলো চীনের এই শি-র তৃতীয় বারের ক্ষমতা পদ্ধতি ও অভিন্ন। শতাধিককালের ওপরে ওই দুই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত নয়। চীনে মাও আমৃত্যু ক্ষমতাসীন ছিলেন। লেনিন, স্ট্যালিনও আমৃত্যু ক্ষমতাসীন ছিলেন। নীতিগত নৈকট্য থাকলেও মাও কোসিগিন, ব্রেজনেভের সময় চীন, রাশিয়ার রাজনৈতিক নৈকট্য এতটা ছিল না এখন যতটা রয়েছে।

শি জিনপিং-এর চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত যেভাবে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠছে তা ভালো চোখে দেখছে না। তাই তার গতি রোধ করতে কসুর করছে না চীন। নিজেদের আর্থিক উপনিবেশ গড়তে পাকিস্তান শ্রীলঙ্কাকে দেউলিয়া করেছে চীন। মানবিক মুখ নিয়ে ভারতের সরকার শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধুদেশ হিসেবে। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার ৪০ লক্ষ পড়ুয়াদের জন্য দশ মিলিয়ন ডলারের পাঠ্যপুস্তক দিচ্ছে ভারত। চীনের পড়শী একমাত্র বিশ্বের হিন্দুদেশ নেপালের সঙ্গে সুপ্রাচীন ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নষ্টের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেদেশের কমিউনিস্ট সরকারের মাধ্যমে। এমনকী উত্তরাখণ্ডের কিছু অংশ নিজেদের মানচিত্রে ঢুকিয়ে নেবার জন্য উসকানি দিচ্ছে শি জিনপিঙের চীন। সুতরাং শি জিনপিঙের তৃতীয়বারের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতভাবে ভারতের পক্ষে সুখকর একেবারেই নয়। চীনের আগ্রাসন প্রতিহত করতে ভারত সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করতে হবে।

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলি।

পর্বতমালায় 'ঘাট' কথার অর্থ

ভারতে সাতটি বড়ো পর্বতমালা রয়েছে। এর মধ্যে আমরা মূলত দুটি পর্বতমালার 'ঘাট' নিয়ে কিছু আলোচনা করব। (১) পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গড় উচ্চতা ১ হাজার ২০০ মিটার। মোট দৈর্ঘ্য ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার। এই পর্বতমালার পশ্চিম সীমানা তাপ্তি নদীর মোহনা থেকে শুরু করে দক্ষিণ বরাবর কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত। পর্বতমালার পশ্চিমে রয়েছে সংকীর্ণ উপকূলীয় সমভূমি। আবার সমভূমির পশ্চিমে রয়েছে আরব সাগর।

উল্লেখ্য, ঘাট শব্দের অর্থ নদী বা জলাশয়ে যাওয়ার সিঁড়ি বা সোপান। উল্লেখ্য, পর্বতমালাটি সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে নেমে সংকীর্ণ সমভূমি হয়ে সাগরে মিলে গেছে। এভাবে নেমে যাওয়া নদীর ঘাটের কথা মনে করিয়ে দেয়, তাই পর্বতমালাকে 'ঘাট' বা পশ্চিমঘাট বলা হয়। পশ্চিমঘাটের অপর নাম সহ্যাদ্রি। নামটি সন্ধি বিচ্ছেদ করলে সহস্র + অদ্রি পাওয়া যায়। এখানে সহস্র শব্দের অর্থ এক হাজার বা অসংখ্য আর অদ্রি শব্দের অর্থ পাহাড় বা পর্বত। সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায়, যে পর্বতমালায় অসংখ্য ছোটো বড়ো অদ্রি বা পাহাড় রয়েছে তাই সহ্যাদ্রি বলা হয়।

(২) পূর্বঘাট পর্বতমালা পূর্ব উপকূলে দাঁড়িয়ে আছে যা ধাপে ধাপে বঙ্গোপসাগরে নেমে গেছে। তাই ঘাট বা পূর্বঘাট কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

কেনাকাটার সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন

সুতপা বসাক ভড়

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।'

স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । বর্ণাশ্রমবিহিত স্বধর্মসাধনে নিধনও কল্যাণকর; কিন্তু অন্যের বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মের অনুষ্ঠান অধোগতির কারণ বলে বিপজ্জনক।

পরিবারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সাধারণত আমরা মহিলারা নিয়ে থাকি, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এগুলির মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হলো কেনাকাটা। আমাদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে আমরা জীবন-যাপন করে থাকি। এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই আশা করব যে ধর্মপথে উপার্জিত আমাদের অর্থ ধর্মপথেই ব্যয় হোক।

সকালে উঠে বাজার যাওয়ার প্রথা আছে। একটু কাঁচা সবজি, ফল সাধারণত আগে কেনা হয়। আমরা এক্ষেত্রে একটু সতর্ক হতে পারি। অন্যান্য বিপরীত মতবাদের বিক্রেতার পরিবর্তে আমরা আমাদের মতাবলম্বীদের থেকে কেনাকাটা করার চেষ্টা করব। ঠাকুর বলেছেন মা কালীর ছবি আছে, এমন দোকান থেকে মাংস কিনতে। তাঁর নির্দেশ একেবারে সুস্পষ্ট। মাছের বাজারেও একইভাবে আমরা সতর্ক থাকব। ফুলের মালা অধিকাংশ এখনও আমাদের সঙ্গীরাই বিক্রি করে। তবু দেখে নেব।

এবার একটু অন্যান্য জিনিস কেনাকাটার দিকে দেখব। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর কলকাতার বাজার। ওইসব স্থান এখনও মূলত হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত। হঠাৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বাজারের মধ্যে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে একজন অহিন্দু রাস্তায় দাঁড়িয়ে অথবা বসে জিনিস বিক্রি করছে। যেমন, ডাব— পাঁচ টাকা। কম দামে বিক্রি করছে। অন্যান্য ফলও ঠেলায় করে একইভাবে বিক্রি করছে। ওদের খুব সহজেই চেনা যায়— দাড়ি-পোশাক দেখে। (সাধারণত লুঙ্গি, টুপি)। কোথাও বা সেলাই মেশিন নিয়ে খোলা আকাশের নীচে বসে গেছে। ওই নির্দিষ্ট দূরত্বে ওদের ভিখারিদেরও দাঁড় করিয়ে রাখছে। আর নিজেদের মধ্যে এমন দূরত্ব বজায় রাখছে, যাতে যে কোনো সময় একজনের পাশে মুহূর্তের মধ্যে জড়ো হতে পারে।

এই মুহূর্তে দ্রুত আমাদের ডেমোগ্রাফিক মানচিত্র পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা চলছে, সুপরিকল্পিতভাবে। এখন যারা দাঁড়িয়ে, খোলা আকাশের নীচে বসে বিক্রিবাটা করছে, তারা আসলে জায়গা দখল করতে চাইছে। সংখ্যায় যখন কম, তখন খুব শান্ত সেজে, ভালো ব্যবহার করে বিক্রি করে, ধীরে ধীরে আরও বেশি সংখ্যায় ওইভাবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। ওরা বিক্রি করে চটকদার জিনিস যেমন— মেয়েদের রূপচর্যার সামগ্রী, নকল সোনার গয়না, আবার মহিলাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সেলাই করে দেয়। সুন্দর ব্যবহার— ভিড় হয় কিশোরী থেকে মধ্যবয়স্কাদের। ভিখারিও ভিক্ষা করে চলেছে। আমাদের প্রশ্রয়েই ওরা বলবৃদ্ধি করে, আসলে আমাদের সমূলে উচ্ছেদ করাই হলো, ওদের লক্ষ্য। ইতিহাস সাক্ষী, সুতরাং বার-বার একই ভুল আমরা করব না। আমরা সচেতন হবো।

ওদের রেস্তোরাঁগুলোর অধিকাংশ খরিদ্দার আমরা। হোয়াট্স্-অ্যাপ এবং অন্যান্য মিডিয়ায় নোংরামোর এত ছবি-ভিডিয়ো দেখছি। এগুলো থেকে কি কিছুই শিক্ষা নেব না? একটু ভাবুন, আমাদের কষ্টোপার্জিত অর্থ নিয়ে আমাদের শেষ করার লক্ষ্যেই ওরা কাজ করছে। আমরা আমাদের পরিবার, সমাজ-দেশ সুরক্ষিত রাখতে চাই। ওদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বারবার একই ভুল করব না। আমরা কেনাকাটাতেও সাবধানতা অবলম্বন করব। আমাদের নিজেদের এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ মূলত বর্তমান মাতৃশক্তির ওপর নির্ভরশীল।

'প্রত্যেক যুগের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তার নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছে। জাতীয়তা এ যুগের ধর্ম। জাতীয়তাবাদের পশ্চাতে রয়েছে ভারতের বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি, জাতীয়তার মধ্যে মিলিত হয়েছে তার প্রবল ধর্মানুরাগ।'

—ভগিনী নিবেদিতা (পৃষ্ঠা-২৭, ভারতবাণী)

এবার ধূমপান ছেড়ে দিন

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

তামাক ও ধূমপান করার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। আজকাল অল্পবয়স থেকেই বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে কমবয়সি ছেলে-মেয়েরা। এর জন্য পানমশলা, গুটখা, সিগারেট, মদ ইত্যাদিকে দায়ী করা হচ্ছে। মদ্যপানও দ্রুতগতিতে ক্যান্সারকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ মদের সঙ্গে এমন কিছু রাসায়নিক মেশানো থাকে যাতে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি বছর ৩১ মে তামাক বিরোধী দিন হিসাবে পালন করা হয়। দুনিয়ার প্রায় ১০০ কোটি মানুষ তামাক সেবন করে থাকেন। তামাক সেবনের ফলে ক্যান্সার ছাড়াও নানান প্রাণঘাতী রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়ে থাকে। ফুসফুস ও শ্বাসকষ্ট জনিত নানা প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হয়। সিগারেটের ধোঁয়াতে ৪৫ রকমের রসায়ন মজুত থাকে যা ক্যান্সার হতে সাহায্য করে। গর্ভবতী মহিলা তামাক সেবন করলে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি এমনকী গর্ভপাত পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের দেশে তামাক সেবন করেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি। এর মধ্যে ১৬ শতাংশ সিগারেট, ৪৪ শতাংশ বিড়ি ও ৪০ শতাংশ অন্য ভাবে তামাক সেবন করে থাকেন। তামাক সেবনের খরচ থেকে অনেক বেশি খরচ তামাক জনিত রোগ ব্যাধির ফলে হয়ে থাকে।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সরকার প্রায় ২৪ হাজার কোটির রাজস্ব তামাক থেকে আদায় করে। আর এর থেকে হওয়া রোগের জন্য সরকারের খরচ হয় ২৮ হাজার কোটি টাকা। আমাদের দেশে শুধু বিড়ি উৎপাদনে ৬ কোটি শ্রমিক নিয়োজিত আছে। ভারতে ২০০৮ সাল থেকে সর্বজনীন স্থানে তামাক ব্যবহার নিষিদ্ধ। এছাড়া তামাকের নিয়ন্ত্রণের জন্য সিওপিটি আইন লাগু আছে, যা তামাকের উৎপাদন ও বিজ্ঞাপনকে নিয়ন্ত্রণ করে। নাবালক ও নাবালিকাদের তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ আছে। আমাদের দেশে ৭৫ কোটি কিলো তামাক প্রতিবছর উৎপাদন হয়ে থাকে। তামাক সেবনে গরিবরাই এগিয়ে। দেশে তামাক সেবনের ফলে প্রতিদিন ২৫ হাজার লোক

মারা যায়। দেশে প্রতিবছর তামাক সেবনের কারণে নয় লক্ষ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ফুসফুস ক্যান্সারের ক্ষেত্রে প্রতি ১০টি কেসের মধ্যে ৯টির জন্যই দায়ী তামাক সেবন।

স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন ধূমপান করে থাকে। ধূমপান যারা করে তাদেরই ভয় সবচেয়ে বেশি। তামাক সেবনের ফলে ফুসফুসে, হৃদয়ে ইত্যাদি স্থানে ক্যান্সার বাসা বাঁধতে পারে। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ক্যান্সার করোনার চেয়ে ভয়ংকর। এই ব্যাধি, যা করোনা রোগীকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়। এর ফলে ধূমপায়ী ব্যক্তির করোনা হবার ও তার ফলে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। সিগারেট যারা পান করেন তাদের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি।

এই সব রোগীর অক্সিজেনের ঘাটতি বেশি থাকে, যার অভাবে মৃত্যু ঘটতে পারে। কারণ ধূমপানের ফলে এদের ফুসফুসে অধিক পরিমাণে নিকোটিন জমা হয় ও ফুসফুসের সর্বাধিক ক্ষতি হয়। ফলে ফুসফুসে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। এর ফলে সিওপিডি নামক ব্যধিতে এরা আক্রান্ত হয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তামাক খাওয়া, চিবনো বা ধূমপান যে ভাবেই ব্যবহৃত হোক না কেন, সবটাই ক্ষতিকারক ও প্রাণঘাতী। খৈনি ব্যবহারকারীদের গলা, জিভ, মাড়ি, ঠোঁট ও পেটে ক্যান্সার বাসা বাঁধে। তামাকসেবীরা খাদ্য পুরোমাত্রায় খেতে পারে না। তাই তামাকের ব্যবহার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ধূমপান বেশ কিছু রোগ ডেকে আনে। এইসব ব্যক্তির করোনা হলে তা অন্যদের থেকে বেশি প্রাণঘাতী হয়ে থাকে। আজকাল বেশির ভাগ রোগী তামাক সেবনের কুফল স্বরূপ নানা রোগে আক্রান্ত হয়। তামাক সেবনের ফলে ২৫ ধরনের ব্যাধি ও ৪০ ধরনের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন মুখ, গলা, ফুসফুস, জিভ, প্রস্টেট, পেট ও ব্রেনে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দেশে মহিলা অপেক্ষা পুরুষরা অধিক মাত্রায় ধূমপান করে। ধূমপানের ফলে ব্রংকাইটিস/অ্যাসিডিটি, টিবি, ব্লাড প্রেসার, হার্ট অ্যাটাক, নপুংসকতা, মাইগ্রেন ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ হতে পারে। ধূমপায়ীদের করোনা বেশিমাত্রায় আক্রমণ করে ও মৃত্যু ডেকে আনে। তাই ধূমপান ছাড়া উচিত।

তামাকসেবী রোগীদের জন্য হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলি লক্ষণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। **ইপিকাক**— ভীষণ বমিভাব, **আর্সেনিক অ্যালবাম**— তামাকের কুফল থেকে মুক্ত করার জন্য। **নাক্সভম**— তামাক ব্যবহারকারীর পেট খারাপের জন্য। **ফসফরাস**— বুক ধরফড়, নপুংসকতা। **ইগ্নেসিয়া**— তামাক চেবানোর জন্য উদ্দার। **প্ল্যান্টাগো**— দাঁতে ব্যাথার জন্য। **সিপিয়া**— স্নায়ু রোগ ইত্যাদির জন্য। **লাইকোপোডিয়াম**— নপুংসকতার জন্য। **জেলসিমিয়াম**— মাথার যন্ত্রণা ও মাথাঘোরা। **টেবেকম**— ২০০ বা ১০০০ শক্তি ধূমপান ছাড়াবার জন্য মাঝে মাঝে নিতে হবে। □

রাজা রাম এবং বঙ্গ-ভারত

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

রবি ঠাকুরের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি পাঠ করেছি। ওখানে 'রামধনু'ই লেখা আছে, 'রংধনু' তো নয়! ''কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া/ রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া/ রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরান ঢালি।'' যদি বলো তবে, ''ফিরিব বাতাস বেয়ে/ রামধনু খুঁজি/আলোর অশোকফুল চুলে দেব গুঁজি।'' তোমার রামধনু চাই? বৃহৎ আকাশের সেই ধনুক চাই? শ্রীরামচন্দ্রের জন্মেরও আগে এই Celestial event ছিল, আগামীদিনেও থাকবে। থাকবে সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, লোকায়তিক চেতনায়— 'রামধনু' হয়ে। তবু ওরা 'রামধনু' বলবেন না। যারা 'রাম'কে অশ্রদ্ধা করেন, অবমাননা করেন, তারা 'রংধনু' বলেন। তারা বঙ্গের শিকড় সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত, শব্দ- জেহাদি। 'রাম' মানে বৃহৎ, বিরাট। 'রাম' মানে অসীম, সীমানায় আবদ্ধ করা যায় না যাকে। রাম মানে সেই সত্তা, যা সবকিছুই রমনীয় করে তোলে, যা মনের আনন্দ, প্রাণের আরাম।

রাজা হিসেবে রাম কেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় দেখিয়ে দিয়েছেন,

''.... কহো মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম।
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহো মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।
নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম।'

ভারতবর্ষের আদর্শ রাজা রাম। আমরা সুশাসন বলতে 'রামরাজ্য' কথাটি ব্যবহার করি। শ্রীরামের সুশাসনের কাহিনি এক বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই সেখানকার মন্দিরগাত্রে, প্রস্তরখণ্ডে রাম-সীতা উপস্থাপিত হয়েছেন শিল্পীর নন্দনতত্ত্বে। তাই মৌখিক সাহিত্য থেকে, শিকড় সংস্কৃতি থেকে রামকাহিনিকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

স্কুল ছাত্রীদের ভগিনী নিবেদিতা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভারতবর্ষে রানি কে? ছাত্রীরা উত্তর দিল, কুইন ভিক্টোরিয়া। নিবেদিতা রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে উত্তেজিত। ধিক্কার দিয়ে সরোষে বলে উঠলেন, ''ভারতবর্ষের রানি কে তাও তোমরা জান না! ইংল্যান্ডের অধিশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়া কখনই তোমাদের রানি হতে পারেন না, তোমাদের রানি সীতা, ভারতবর্ষের চিরকালের রানি সীতা।'' একইভাবে ভারতবর্ষের চিরকালের রাজা রাম। রাজা রাম সার্বভৌম সম্রাট, মনের রাজা। বনবাসী, গিরিবাসী, জনজাতির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল অচ্ছেদ্য।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি। তখনো নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠেননি। কল্পতরু দিবস অতিবাহিত হয়ে গেছে (১৮৮৬, ১ জানুয়ারি); শ্রীরামকৃষ্ণ তখন খুব অসুস্থ। তাঁকে নরেন্দ্রনাথ বলছেন, এখন থেকে তাকে প্রত্যহ বলে দিতে হবে সেদিন সাধন ভজন কীভাবে করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তাঁর আদরের

নরেনকে নিজের কুলদেবতা রঘুবীরের ইষ্টমন্ত্র দিলেন। নরেন শক্তিমান পুরুষ, ধর্মযোদ্ধা। ন্যায়পরায়ণ হয়ে ওঠার জন্যই রামনামে আবিষ্ট করেছিলেন সেদিন। পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরাম বনবাসী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষাত্রধর্ম অক্ষুণ্ণই ছিল। বনবাসী জীবনে কখনোও অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ রাখেননি রাম। যখনই প্রয়োজন হয়েছে অস্ত্র চালাতে দ্বিধা করেননি। শ্রীরামচন্দ্র কেন অস্ত্র ত্যাগ পরিত্যাগ করবেন! এ যে ক্ষাত্রধর্ম! শ্রীরামের এই অনন্য রূপের মধ্যেই রয়েছে চিরন্তন ভারতবর্ষের চিন্তন--- শৌর্যশালী অথচ তাপসমালী। তপোবনে ভারতীয় সভ্যতার অনন্য উপাচার আর নগর রাজধানীতে বিক্রমশালী প্রজারঞ্জন রাজা— এই দুয়ের এক অমিত মেলবন্ধন শ্রীরামচন্দ্র।

স্বামী বিবেকানন্দ যে বীর সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছেন তা হয়তো এই রঘুবীরের সাধনায়। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্যকে নিজকুলের ইষ্টনাম দিয়ে সেই সাধনার ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন, বঙ্গভূমিতে শ্রীরামকে পুরনরুজ্জীবিত করে গেছেন। ১৩ জানুয়ারি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীম (মহেন্দ্র গুপ্ত) দেখছেন, নরেন্দ্রনাথ পাগলের মতো রামনাম গাইছেন; অবশেষে ১৬ জানুয়ারি নরেনকে শ্রীরাম সন্ন্যাসীবেশে দর্শন দিলেন। ১৯ জানুয়ারি নরেন্দ্র, নিরঞ্জন প্রমুখ সেই সন্ন্যাসীরূপী রামের মতো রামাইত সাধুর বেশ ধারণ করলেন। নরেন যে সপার্ষদ সন্ন্যাসী হতে চান এবং তা ক্ষত্রিয় রামের সন্ন্যাস-বেশী রূপে তা তিনি বুঝিয়ে দিলেন।

রামায়ণের অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করবার জন্য মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন, 'কৃত্তিবাসের রামায়ণে আলাদা করে কোনো অন্ত্যজ ভাবনা থাকতে পারে না। তিনি সংস্কৃত রামায়ণ অসামান্য ভাষায় ও ছন্দে বাংলায় লিখেছিলেন মাত্র" (মহাশ্বেতা বেদী, ১৩৯৫, কৃত্তিবাসের রামায়ণে অন্ত্যজ ভাবনা, কবি কৃত্তিবাস সংকলন গ্রন্থ, ফুলিয়া-বয়রা, নদীয়া, পৃষ্ঠা ১৫১)।

সত্যিই কি তাই?

(১) শ্রীরামের সঙ্গে চণ্ডাল গুহকের মিতালি কবি কৃত্তিবাস যে ভাষায় আলোচনা করেছেন, তারপর মহাশ্বেতা দেবী কীভাবে বলেন, কৃত্তিবাসে অন্ত্যজ ভাবনা অনুপস্থিত? কৃত্তিবাস লিখছেন, ''চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে/ পতিতপাবন নাম তবে কি কারণে।" মনে রাখার মতো বিষয়, কৃত্তিবাস যখন এমন কথা লিখছেন, তখনও আবির্ভূত হননি সাম্যবাদী, ভক্তি আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রীচৈতন্যদেব। এমন শ্রুতকীর্তি মানুষকে নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর 'সাড়েচ্ছয়ানা' মন্তব্য আমাদের ব্যথিত করে।

(২) সুগ্রীবের সঙ্গে শ্রীরামের সখ্য বানরকুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কীসের ইঙ্গিতবাহী?

(৩) অন্ত্যজ শবরীর হাতে শ্রীরাম ফল গ্রহণ করছেন, সেই জায়গাতেও কৃত্তিবাস মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

রামায়ণের শিকড় যে কতটা মজবুত তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে জনজাতি কৌমগোষ্ঠীর পুরাণকথাগুলিতে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিরহড় লোককথা, 'রাম-সীতা- হনুমান' গল্প। সেখানে তেঁতুলাপাতা আর খেজুরপাতার অভিযোজনের গল্প, তার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র সম্পৃক্ত। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনে চলে গেল। সেখানে তারা 'উখলু' বিরহড়দের মতো যাযাবরের জীবন কাটাতে লাগল। থাকত পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘরে। একবার এক মস্ত তেঁতুলগাছের তলায় ঘর তৈরি করল তারা। সেই সময় তেঁতুলগাছের পাতা ছিল মস্ত বড়ো বড়ো। ভেতর দিয়ে রোদ ঢুকতে পারত না। রাম ভাইকে বলল, আমরা বনবাসে এসেছি, এখানে কষ্টে থাকতে হবে, আরাম করা চলবে না। কিন্তু এই গাছের ছায়ায় আমরা সুখে আছি, আমাদের গায়ে রোদ-বৃষ্টি লাগছে না। এটা তো ঠিক নয়। তুমি তির মেরে পাতাগুলোকে চিরে দাও। লক্ষ্মণ তির মেরে তেঁতুল পাতাগুলোকে চিরে ফালা ফালা করে দিল। এক-একটা পাতা চিরে অনেক ছোটো ছোটো পাতা হয়ে গেল, সেই পাতার মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির জল আর রোদের তাপ তাদের দেহে লাগল, সেইদিন থেকেই তেঁতুলপাতা এত ছোটো ছোটো হয়ে গেল।

আবার চলছে তিনজন বনপথ দিয়ে। এবার তারা ঘর তৈরি করল খেজুরগাছের নীচে। সেকালে খেজুরের পাতা ছিল খুব লম্বা আর চওড়া। বৃষ্টির জল আটকে দিত সেই পাতা। রাম আবার তার ভাইকে তির ছুড়তে বলল। লক্ষ্মণ তির মেরে পাতাগুলোকে সরু সরু করে দিল। সেদিন থেকে খেজুরপাতা সরু সরু হয়ে গেল। এই গল্পটি জনজাতি সমাজে প্রচলিত অনেকানেক গল্পের মতোই যা প্রমাণ করে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি জনজাতি কৌমসমাজেরও উত্তরাধিকার।

কবে থেকে বাঙ্গালি রামনামে জারিত? কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালীর স্বাদ বাঙ্গালি পেয়েছে অন্তত ছ'শো বছর আগে। অনুমান করা যায় তার আগে থেকেই বাঙ্গলার প্রবুদ্ধমহলে সংস্কৃতে বাল্মীকি রামায়ণ চর্চা ছিল এবং লোককথায় তার অবিসংবাদিত বিস্তারও ছিল। লোকায়ত মানসে এমন শক্ত ভিত্তি না থাকলে কৃত্তিবাস এমন জনপ্রিয় ও লোকপ্রিয় রামায়ণ লিখতে প্রেরণা পেতেন না।

রবীন্দ্রনাথের মতে, বাঙ্গলাদেশে যে জনসাধারণকে একটা ভক্তির প্লাবনে প্লাবিত করে তুলেছিল; সেই ভক্তিধারার অভিষেকে উচ্চ-নীচ, জ্ঞানী-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র সকলেই এক আনন্দের মহাযজ্ঞে সম্মিলিত হয়েছিল— বাঙ্গলা রামায়ণ সেই ভক্তিযুগের সৃষ্টি। বাঙ্গলাদেশে

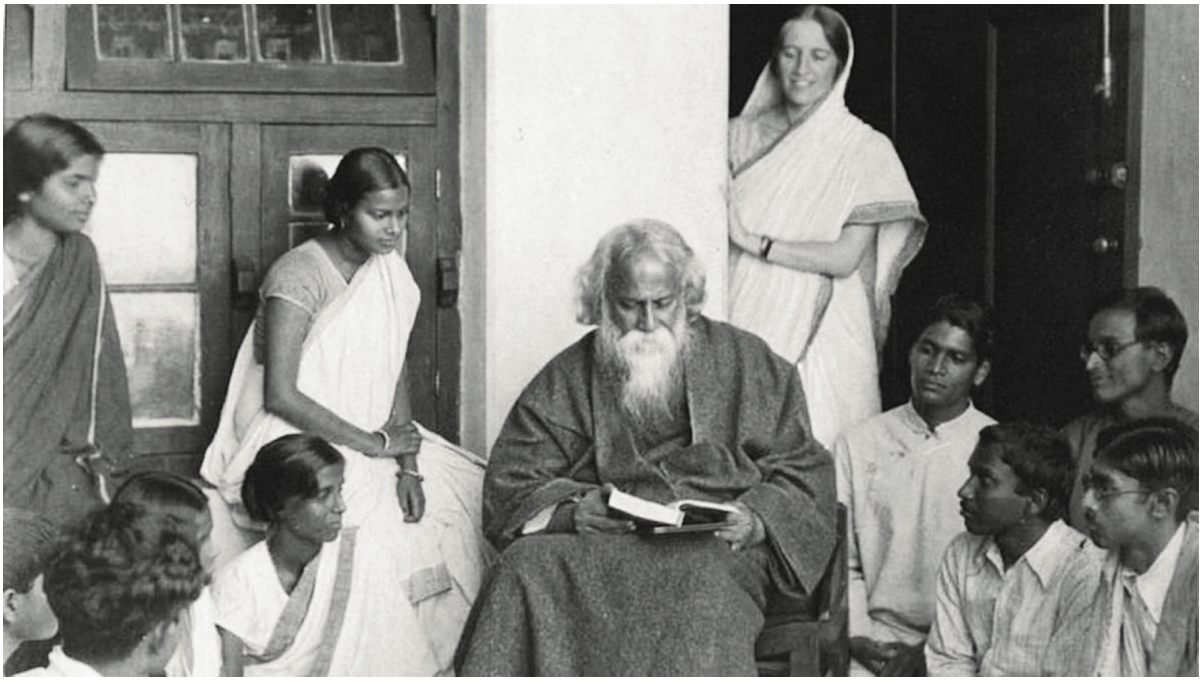

একটা নবোৎসাহের নব-বসন্ত এসেছিল বলেই তাঁর মত (যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'সরল কৃত্তিবাস' গ্রন্থের ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৫)।

মনে রাখতে হবে তুলসীদাসী 'রামচরিতমানস' লেখা হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেক পরে। সম্ভবত রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বির্তকে বাঙ্গালিকে শামিল না করার 'সেকুলারি-চালাকি' করেছিলেন কিছু 'অসত্য কথা-বলা ইতিহাসবেত্তা'। শ্রীরামকৃষ্ণের কুলদেবতা ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। স্বামী বিবেকানন্দের রাম-উপাসনা, রানি রাসমণির রঘুবীর-সাধনাকে বাঙ্গালি ভুলে গেছে। বাঙ্গালি কীভাবে ভুলে যায় মহামন্ত্র! 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ / কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।/ হরে রাম হরে রাম/ রাম রাম হরে হরে।'

রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়ন নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাদের লেখা থেকে জানা যায়, সবচাইতে বেশি দাগানো বই যা তিনি পড়েছিলেন এবং বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে আজও সংরক্ষিত আছে, তা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত (১৩৪৩) 'কৃত্তিবাস রামায়ণ'। কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাঁর জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তার পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের এক সম্পর্কিত দিদিমার মালিকানাধীন কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি বই ছিল। তা পড়তে গিয়ে করুণ বর্ণনায় তাঁর চোখ দিয়ে যখন টপটপ করে জল পড়ত, দিদিমা জোর করে তাঁর হাত থেকে বইটি কেড়ে নিয়ে যেতেন। রামায়ণ পড়ে কান্নার কথা 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধেও লিখেছেন তিনি। ভৃত্যশাসনে রবীন্দ্রনাথের পড়া বইগুলির অন্যতম হলো কৃত্তিবাসী রামায়ণ। তার স্মৃতি সারা জীবনের জন্য তাঁর কাছে অহংকার।

রবীন্দ্রনাথকে রামায়ণ সম্পর্কিত 'মিথোম্যানিয়ায় আক্রান্ত' হতে দেখি। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ ও 'সহজপাঠ'-এ রবীন্দ্রনাথ শিশু মনকে রামায়ণে জারিত করে দিয়েছেন, 'ওইখানে মা পুকুরপাড়ে/জিওল গাছের বেড়ার ধারে/হেথায় হবো বনবাসী/কেউ কোথাও নেই।' তিনি লিখছেন, এই রামায়ণ, মহাভারত আমাদের সমস্ত জাতির মনের খাদ্য ছিল। এই দুই মহাগ্রন্থই আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্গতি থেকে রক্ষা করে এসেছে। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠিতে লিখছেন, 'কৃত্তিবাসের রামায়ণ যদি বাঙ্গালি ছেলেমেয়েরা না পড়ে তবে তার চেয়ে শোচনীয় আশঙ্কা আমাদের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না।'

রামায়ণ আছে রবীন্দ্র-সংগীতে— 'তোরা যে যা বলিস ভাই/ আমার সোনার হরিণ চাই।' 'রাম' বলতেই ভারতীয় শিশুর কাছে এক অমোচ্য চিত্র ফুটে ওঠে। আর এই মিথোমানিয়ার জন্যই সহজপাঠ বইটি আজ অনেকের কাছে ব্রাত্য। শিশু কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ দু'ভাবে শিশুকে রামায়ণের সঙ্গে সংস্পৃক্ত করে দিচ্ছেন— নাম-বাচক শব্দে এবং প্রকৃতি চিত্রণে। কখনো নাম না বলেই শিশু রামায়ণের দেশে পাড়ি দিয়েছে— 'মা গো, আমায় দে না কেন/একটি ছোটো ভাই—/ দুইজনেতে মিলে আমরা/বনে চলে যাই।' নাম না করেও শিশু নিজের সঙ্গে শ্রীরামকে অভেদ কল্পনা করেছে। ছোটো ভাইটি যে সহোদর লক্ষ্মণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতি চিত্রণে রামের বনবাস-জীবন শিশুর কল্পনায় মুহূর্তেই চলে আসে— 'চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই/ এমনি বরষাতে...'।

রাজপুত্রের বনবাসী হয়ে যাওয়া ভারতীয় শিশুর মানস-কল্পনায় কতটা প্রভাব এনেছিল, 'সহজপাঠ'-এর একটি কবিতায় কবি তা এক লহমায় ধরে দিয়েছেন— 'ঐখানে মা পুকুরপাড়ে/জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে/হোথায় হব বনবাসী—/ কেউ কোথাও নেই। কী বলবেন একে, মিথোম্যানিয়া নয়? রামায়ণ-ম্যানিয়া নয়! পারবেন তো এই শিকড়কে কেটে দিতে! আমার কিন্তু একজন রবীন্দ্রনাথ আছেন। আপনার? ▮

ভারত ভাবনা ও শ্রীরামচন্দ্র

ড. জিষ্ণু বসু

ভারতবর্ষ সম্পর্কে চীনের দার্শনিক হু শি একটি গভীর কথা বলেছিলেন—' ভারতবর্ষ তার একজন সৈন্যকে সীমান্তের এপারে না পাঠিয়েও কুড়ি দশক চীনকে সাংস্কৃতিকভাবে জয় করেছে আর নিজের আধিপত্য বজায় রেখেছে।'

শক্তিশালী ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর কল্যাণের চেষ্টা করেছে। কোথাও চাষ করা শিখিয়েছে, আবার কখনো গণিতে বা জ্যোতির্বিদ্যার পাঠ দিয়েছে। কিন্তু বিজিত রাজ্যকে শোষন করে লুঠের ধন দেশে আনেনি। অন্যায় অত্যাচার হলে অপরাধের নিবারণের পর সেখানকার মানুষকেই রাজ্যপাটের ভার দিয়ে নিজের দেশে চলে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদী অধিকার স্থাপন করেনি।

আবার যখন ভারত দুর্বল হয়েছে। বহিরাগত নির্মম অত্যাচারীর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তখনো নিজেকে রক্ষা করেছে, একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। যেখানে যেখানে আরব আক্রমণকারীর থাবা পড়েছে অথবা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের গ্রাসে এসেছে, সেইসব জায়গায় মাত্র একশো বছরের মধ্যে প্রাচীন সভ্যতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ কায়রোর পথে কোনো ব্যক্তির নাম 'তুতেনখামেন' বা 'রামেসাস' পাওয়া যাবে না। কিন্তু আজও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রতি রাজ্যে প্রতি জেলায় অন্তত একশো পাওয়া যাবে যাদের নামে কোনো না কোনোভাবে 'রাম' শব্দ জুড়ে আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় মায়া সভ্যতাও খুব উন্নত ছিল। মায়ারা পাঁচশো বছরের ক্যালেন্ডার বানিয়েছিলেন। কিন্তু স্পেনীয় আক্রমণ মাত্র কয়েকশো বছরে সেই সভ্যতাকে থেঁতলে দিয়েছে।। আজ পেরু, মেক্সিকো বা লাতিন আমেরিকার কোনো দেশে একজন লোককে পাওয়া যাবে না যারা তাদের প্রচীন ভাষায় কথা বলেন। যারা তাদের পূর্বপুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, মেয়েদের পশুর মতো ব্যবহার করেছে, তাদের ভাষা মানে স্প্যানিশ বা পর্তুগিজ ভাষায় তাদের কথা বলতে হয়। কিন্তু আজ অসম থেকে গুজরাটের মানুষ নিজের পূর্বপুরুষের ভাষাতেই কথা বলেন।

ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীতেই ব্যতিক্রম। ভারতবর্ষে উপনিষদের শিক্ষাই সমাজকে চালিত করেছে। বহু ভিন্নতার মধ্যেও পৃথিবীর মানুষ একই পরমাত্মতার অংশ। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।। এই মন্ত্রই শিখিয়েছে যে পরের ধনে লোভ করতে নেই। ভারতবর্ষ তাই ঔপনিবেশিক শাসনের লোভ কখনোও করেনি।

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র ভারত-আত্মার প্রতীক। যুগ যুগ ধরে ভারতের রাজা, মহারাজারা রামরাজ্য বানানোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছে, সমাজ ভরতের মতো নিঃস্বার্থ ভাবে দায়িত্ব পালন করেছে, সংসারের প্রয়োজনে, পতির পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজার দুলালি সীতা পতির সঙ্গে বনগমন করেছেন– সোনার প্রতিমা কে যেন অকালে ভাসিয়েছে ভারতের কোণে কোণে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। রাজরানি সুখভোগ ত্যাগ করে সন্তান প্রতিপালন করেছেন। তাই লব-কুশের মতো সুশীল অথচ মহাবীর সন্তান পেয়েছে সমাজ। সমাজে রামচন্দ্রের সরল, সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ জীবন আদর্শ হয়েছে। রামচন্দ্রের জীবন যেন আয়না। পতির কর্তব্য, জ্যেষ্ঠভ্রাতার কর্তব্য, অভিভাবকের-প্রজাপালকের কর্তব্য। যখনই কোনো প্রশ্ন এসেছে, রামের জীবন দেখে ভারতবর্ষ নিজেকে সঠিক পথে চালিত করেছে।

লড়াই করে বেঁচে থাকার, জিতে যাওয়ার পাঠও ভারতবাসী রামায়ণ থেকে নিয়েছে। ষোড়শ শতক। মুঘল শাসন মধ্য গগনে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, হিন্দু সমাজ, শাস্ত্রাচার উত্তর ভারতে নিভে যেতে বসেছে। গোস্বামী তুলসীদাস লিখলেন রামচরিত মানস, হনুমান চাল্লিশার মতো সঞ্জীবনী গ্রন্থ। সংস্কৃতে নয়, সহজ আঞ্চলিক অওধি ভাষায়। মুঘল সম্রাট আকবর বন্দি করলেন তুলসীদাসকে ফতেপুর সিক্রির কারাগারে। তাই হনুমান চাল্লিশার দুটি পঙ্‌ক্তি শতশত বছর প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছিল ঃ জো শতবার পাঠ করে কোঈ। ছুটহি বন্দি মহাসুখ হোঈ।। যে এই মহা বলশালী হনুমান চাল্লিশা একশোবার পাঠ করে, সে বন্দি দশা থেকে মুক্তি পায় এবং মহাসুখ লাভ করে।

কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'প্রাচীন বাঙালি সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।' সত্যি বলতে কী, বঙ্গভূমি এত অত্যাচার অনাচারের পরও যে এখনো আফগানিস্তান হয়ে যায়নি তার অন্যতম কারণ এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ। বঙ্গদেশের গ্রামে-গ্রামে, গঞ্জে-শহরে-নগরে চণ্ডীমণ্ডপে মণ্ডপে হিন্দু সমাজ রামায়ণ পাঠ করেছে আর সংগঠিত হয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। রামায়ণকেন্দ্রিক বঙ্গভূমির এই জাগরণকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালি সমাজজীবনের স্বর্ণযুগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আধুনিক ভারতের নবজাগরণের মূলে ছিল রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দের ভাব আন্দোলন। সেই জনজাগরণের প্রারম্ভের সময়ে ছিল ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ। জমিদারের কথামতো মিথ্যা বলতে রাজি না হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের অর্থাৎ গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃদেব ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে তাঁদের পৈতৃক বাসস্থান ছেড়ে দেড়েগ্রামে চলে আসতে হয়। সেদিন ক্ষুদিরাম তাঁদের পৈতৃক বাসভূমি ছেড়ে কামারপুকুরে চলে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁদের কুলদেবতা রঘুবীরের বিগ্রহকে। দেড়েগ্রাম ত্যাগের পর তাঁদের জীবন নির্বাহের জন্য সুখলাল গোস্বামী যখন একবিঘা দশ ছটাক জমি প্রদান করলেন, তার আগে পর্যন্ত চট্টোপাধ্যায় পরিবারের একমাত্র অবলম্বন ছিল কুলদেবতা রঘুবীরের বিগ্রহ। তাই বঙ্গদেশ-সহ ভারতবর্ষের সব প্রান্তে শতশত বছরের পাথেয় হয়ে থেকেছেন শ্রীরামচন্দ্র আর রামায়ণ। এস ওয়াজেদ আলী তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ'-এ এক অপরূপ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাতে সাধারণ এক মুদিখানা দোকানদারের কথা আছে। যে পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম একইভাবে রামায়ণ পাঠ করেছে আর নিজেদের দেশ ও সমাজের পরম্পরা বহন করে চলেছে। ওয়াজেদ আলীর ভাষায় ভারতবর্ষে 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।'

ভারত ভাবনার একেবারে মূলে আছেন শ্রীরামচন্দ্র। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

নদীসমা প্রেরণাকে পদ্ম সম্মান

নিখিল চিত্রকর

নদীমাতৃক সভ্যতার দেশ আমাদের এই ভারত। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই আমাদের সমাজে নারীদের বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। অপালা, ঘোষা, লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ী নামগুলি সর্বজনবিদিত। বৈদিক যুগে এই নারীদের হাত ধরেই সমাজের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। নারীরাই সমাজের নদীসমা প্রেরণাস্রোত। নতুন ভারতে নারী শক্তির ভূমিকা আরও বেশি মজবুত হয়ে উঠছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় নারীরা তাঁদের অসামান্য কীর্তি স্থাপন করছেন। ভারত সরকার তাঁদের কয়েকজনকে এবার দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'পদ্মশ্রী' দিয়ে সম্মানিত করেছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আবহে এই সম্মান অচিরেই তরুণ প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করবে। স্বস্তিকার পাতায় সেই সব পদ্মশ্রী প্রাপকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

ঊষা বার্লে
পাণ্ডবনী শিল্পী

পাণ্ডবনী লোকগীতির ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবছর পদ্মশ্রী পেয়েছেন ঊষা বার্লে। পাণ্ডবনী হলো ছত্তিশগড়ের একধরনের লোকগানের শৈলী যা প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য ও পাণ্ডবদের বিজয়গাথা অবলম্বনে রচিত। মাত্র ৭ বছর বয়েস থেকেই পাণ্ডবনী লোকগানের প্রতি অনুরাগ গড়ে ওঠে ঊষার। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই লোকগানের প্রতি তাঁর আগ্রহ আরও বাড়ে। পরবর্তীকালে তিনি পাণ্ডবনী লোকগান নিয়েই চর্চা ও গবেষণা করেন। তবে পাণ্ডবনী লোকগানের ধারা অনেকের কাছেই বোধগম্য ছিল না তখন।

ঊষা বার্লে জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ বুঝতেই পারতেন না যে তিনি কোন্ ধরনের সংগীতচর্চা করেন। ধীরে ধীরে এই লোকসংগীত শোনার জন্য সাধারণ মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, পাণ্ডবনী লোক সংগীত জনপ্রিয় হতে শুরু করে। বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে ডাক পান ঊষা বার্লে। ফলস্বরূপ নিজের রাজ্য এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে পাণ্ডবনী লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি পান ঊষা। ভারতের বাইরেও বিশ্বের বেশ কিছু দেশে পাণ্ডবনী লোকগীতির প্রসারে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। ভারতের প্রাচীন লোকগীতির ঐতিহ্যের ধারা বিলুপ্ত হতে বসেছিল, অদম্য প্রয়াসের ফলে তা সংরক্ষণ করেছেন ঊষা বার্লে। তাঁর এই প্রয়াসকে সম্মানিত করে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করেছে ভারত সরকার। ঊষা বার্লে বলেন, 'এই পুরস্কার তাঁদের সবার কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে যারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট।'

সুভদ্রা দেবী
পাপিয়ে ম্যাসে শিল্পী

কাগজের মণ্ড থেকে শিল্পকার্য তৈরির জন্য পদ্মশ্রী পেয়েছেন বিহারের মধুবনীর বাসিন্দা সুভদ্রা দেবী। তিনি দীর্ঘ ৬৫ বছর ধরে এই হস্তশিল্পের পরম্পরা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে বেশ কিছু শিল্প ও কারুশিল্প কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ফোক আর্ট গ্যালারিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৮০ সালে বিহার সরকার তাঁকে পুরস্কৃত করে। জাতীয় পুরস্কার পান ১৯৯২ সালে।

ডঃ সুকামা আচার্য্য
শিক্ষিকা

নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছেন ডঃ সুকামা আচার্য্য। দীর্ঘ ৩৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে বৈদিক সংস্কৃতির প্রসারে সচেষ্ট রয়েছেন হরিয়ানার রোহতকের রুড়কি গ্রামের বিশ্বেশ্বরা কন্যা গুরুকুলের শিক্ষিকা ডঃ সুকামা। গুরুকুলের মেয়েদের তিনি ভারতের সংস্কৃতি, পরম্পরা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে পড়ান। তিনি বিশ্বাস করেন প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি জীবনে সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতারও সমান গুরুত্ব আছে। ভারতের দশটিরও বেশি রাজ্যের ৮৫০ জন মেয়ে পড়াশোনা করে বিশ্বেশ্বরা কন্যা গুরুকুলে।

এখানে আজও গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শিক্ষার প্রচলন রয়েছে। সংস্কৃতি সেবা সম্মানেও সম্মানিত হয়েছেন ডঃ সুকামা আচার্য্য।

হিমপ্রভা ভুটিয়া
বয়ন শিল্পী

এবছর পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন অসমের ডিব্রুগড় জেলার মোরানের বাসিন্দা হিমপ্রভা ভুটিয়া। বলা হয় যে অসমের মহিলাদের বুনন দক্ষতা এতই সূক্ষ্ম ও নিটোল যে তাঁরা তাঁদের স্বপ্নও সিল্কের কাপড়ের ওপর বুনে ফেলতে পারেন। তুলো, রেশম এবং সূক্ষ্মভাবে কাটা বাঁশের টুকরো থেকে কাপড় ব্যবহার করে তার ওপর হিন্দু ধর্মগ্রন্থের কথা সেলাইয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন হিমপ্রভা। তিনি ২৮০ লম্বা এবং ২ ফুট চওড়া একটি কাপড়ের টুকরোতে সম্পূর্ণ ভগবদ্গীতার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। সুতি ও সিল্কের গামোসায় (গামছা) সুন্দর নকশা তৈরি করতে পুঁতি ব্যবহার করেন, যা ওই অঞ্চলে ব্যবহৃত নকশা থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র।

কেসি রানরেমসাংগি
মিজো লোক সংগীত শিল্পী

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশে মিজো লোকসংগীতের প্রচারের কাজ করে যাচ্ছেন মিজোরাম আইজলের বাসিন্দা কেসি রানরেমসাংগি। তিনি জানিয়েছেন যে নেহাত শখের বশেই খুব অল্প বয়সে তিনি গান ও নাচ শুরু করেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে গানের প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। একসময় তাঁর গাওয়া মিজো লোকসংগীত সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রথম দিকে গির্জার অনুষ্ঠান এবং বিয়েবাড়িতেই তিনি মিজো গান গাইতেন। পরে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে গাওয়ার সুযোগ পান। তিনি লোক সংস্কৃতি, ধর্মশিক্ষা এবং প্রেম-সহ বিভিন্ন ঘরানার ৫০টিরও বেশি গান রেকর্ড করেছেন। লোকসংগীতের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৭ সালে সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। এবছর পদ্মশ্রী প্রাপকদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন মিজো লোক সংগীত গায়িকা কেসি রানরেমসাংগি।

জোধাইয়াবাঈ বৈগা
চিত্রশিল্পী

শিল্পকলাব ক্ষেত্রে চমৎকার কাজের জন্য মধ্যপ্রদেশের জোধাইয়াবাঈ বৈগাকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হয়েছে। শিল্পকলা চর্চার পাশাপাশি তিনি জনজাতি এলাকা এবং জনজাতি মহিলাদের উন্নতির জন্য কাজ করেছেন। ২০০ জনেরও বেশি জনজাতি মহিলা ও শিশুদের ছবি আঁকার প্রশিক্ষণ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে সহায়তা করেছেন জোধাইয়াবাঈ। তাঁর আঁকা ছবি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে নারীশক্তি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ভারতের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকও তাঁকে সম্মানিত করেছে।

সুমন কল্যাণপুর
সংগীত শিল্পী

চার দশকেরও বেশি সময় ধরে নিজের গানের মধ্য দিয়ে সংগীতপ্রেমীদের মন জয় করেছেন সুমন কল্যাণপুর। গত ৩০ বছর তিনি গানের জগৎ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তা সত্ত্বেও মানুষ তাঁকে ভুলে যাননি। হিন্দি, মরাঠি, বাংলা ও অসমীয়-সহ ১১টি ভাষায় গান গেয়েছেন সুমন কল্যাণপুর। সারাজীবনে ৭৫০টি গান রেকর্ড করেছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর-জয়কিষন, লক্ষ্মীকান্ত- প্যারেলাল, আরডি বর্মণ-সহ দশ জনেরও বেশি খ্যাতনামা সংগীত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। মহারাষ্ট্র সরকার তাঁকে লতা মঙ্গেশকর পুরস্কারে সম্মানিত করে। সংগীত জগতে বিশেষ অবদানের জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন সুমন কল্যাণপুর।

বাণী জয়রাম
সংগীত শিল্পী

গুড্ডি ছবির বিখ্যাত গান 'হামকো মন কি শক্তি দেনা' গানটি গেয়ে সারা ভারতের মন জয় করেছিলেন বাণী জয়রাম। আশির দশকের এই বিখ্যাত গানটি আজও ভারতের অনেক স্কুলে প্রার্থনা সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়। সেই গানের কণ্ঠশিল্পী বাণী জয়রাম এবার ভারত সরকারের পদ্মশ্রী সম্মান পেলেন। সংগীত জগতে দীর্ঘ ৫০ বছরের কেরিয়ারে ২০ হাজারেরও বেশি চলচ্চিত্রের গান ও ভজন গেয়েছেন তিনি। হিন্দি, তামিল, মালায়ালাম, মরাঠি ও গুজরাটি-সহ ১৫টিরও বেশি ভাষায় গান গেয়েছেন বাণী। পপ সংগীত, গজল, ভজন, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে লোক সংগীত—সবক্ষেত্রেই সাবলীল ছিলেন এই ভার্সাটাইল সংগীত তারকা। মাত্র ৮ বছর বয়েস থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োয় গানের অনুষ্ঠান শুরু করেন বাণী। সর্বকনিষ্ঠ গায়িকা হিসেবে তিনি সংগীতপীঠ পুরস্কার পান। তিনবার তিনি জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হন। ■

সংস্কার ভারতী ও সৃষ্টির উদ্যোগে দোল উৎসব উদ্‌যাপন

উত্তরের সংস্কার ভারতী গাজোল এবং আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'সৃষ্টি'র যৌথ উদ্যোগে মালদা জেলার গাজোলে গাজোল শান্তি লজের প্রাঙ্গণে দোল উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন সুদক্ষ হস্তশিল্পী তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুদাম নন্দী। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন গাজোল মহাবিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী। প্রদীপ প্রজ্বলন করে ভারতমাতা ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করার পর পাশের রাধাগোবিন্দ মন্দিরে বিগ্রহের পাদপদ্মে পুষ্প ও আবির নিবেদন করেন সংস্কার ভারতীর জেলা সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার এবং সৃষ্টির কর্ণধার সঞ্জীব সরকার-সহ অন্যান্য অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে প্রাস্তাবিক ভাষণ রাখেন সংস্কার ভারতীর মালদহ জেলা সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার। তারপর শুরু হয় সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন। সংগীত পরিবেশন করেন সুপ্রিয় মজুমদার, পল্লবী ঘোষ, শ্রেয়া গোস্বামী, দেবাশিস মজুমদার, খুদে শিল্পী নির্মাণ সরকার ও তার মা মানসী ভৌমিক সরকার। সৃষ্টির শিক্ষার্থীদের সমবেত আবৃত্তি মুগ্ধ করে। মাঝে নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী ও সুদাম চন্দ্র নন্দী বক্তব্য রাখেন। রাষ্ট্রবন্দনার পর মিষ্টিমুখ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তিলপাড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ১২ মার্চ বীরভূম জেলার তিলপাড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় সিউড়ি বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের রামকৃষ্ণ সভাগারে। শঙ্খধ্বনি ও সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ

হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তপন ভড় এবং সংগঠন সম্পাদক তারক দাস সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শান্তি কুমার মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রমুখ বিশ্বনাথ দে ও লক্ষ্মণ বিষ্ণু। এরপর বিভিন্ন বিষয়ে ভালো উপস্থাপনার জন্য শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্বে শিশুদের দ্বারা নাচ, গান, আবৃত্তি এবং 'হিংসুটে দৈত্য' অবলম্বনে একটি গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রধান আচার্য উজ্জ্বল নায়েক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিশুমন্দিরের সম্পাদক মহাশয়।

গত ১১ মার্চ সক্ষম উত্তরবঙ্গ প্রান্ত এবং জলপাইগুড়ি জেলা দিব্যাঙ্গ সেবা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ১০০ জন দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেদের ট্রাই সাইকেল, হিয়ারিং এইড প্রভৃতি সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়।

মালদহের ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হিন্দু সংস্কৃতি সম্মেলন ও বৈদিক শান্তিযজ্ঞ

গত ৪ ও ৫ মার্চ মালদহ জেলার গাজোল ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব, হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন ও বৈদিক শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনের এই অনুষ্ঠানে এলাকার হাজার হাজার ভক্ত অংশগ্রহণ করেন ও বহু মানুষ দীক্ষা গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভক্তিমূলক গান, তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা, লাঠিখেলা ও যোগাসন প্রদর্শিত হয়। ধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলনে বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসী বক্তব্য রাখেন। বিশেষ বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদহ বিভাগ কার্যবাহ শ্যামল পাল। অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

চাঁচোলে অর্শ চিকিৎসা শিবির

সেবা ভারতী উত্তর মালদহ ট্রাস্টের উদ্যোগে গত ৫ মার্চ চাঁচোল মাড়োয়ারি ধর্মশালায় একটি অর্শ চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সেবা ভারতী দীর্ঘ তিন দশক ধরে এই শিবির পরিচালনা করে আসছে। এর ফলে এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এবছর

চিকিৎসক এম দাস এবং এস গুপ্তর তত্ত্বাবধানে ৬৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সেবা ভারতী উত্তর মালদা ট্রাস্টের সভাপতি সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী , সম্পাদক ষষ্ঠী শর্মা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা বিভাগ প্রচারক বাদল দাস, উত্তর মালদা জেলা প্রচারক সুধীরচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ।

সংশোধনী

গত ৬ মার্চ সমাবেশে সমাচার বিভাগে পড়তে হবে 'পশ্চিম মেদিনীপুর যমুনাবালী সারদা বিদ্যামন্দিরের অন্বেষা ব্যানার্জি..' এবং 'পশ্চিম মেদিনীপুর গণপতিনগর সরস্বতী শিশু বিদ্যামন্দিরের আদিত্য সিংহ'। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত। —স্বঃ সঃ

মুরারীপুর শাখায় বীর প্রশান্ত মণ্ডল বলিদান দিবস উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের মতো এবারও গত ১৬ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুরারীপুর শাখায় বীর প্রশান্ত মণ্ডল বলিদান দিবস উদ্‌যাপিত হলো। এলাকার স্বয়ংসেবকরা এদিন মুরারীপুর শাখায় উপস্থিত হয়ে বীর প্রশান্ত মণ্ডলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা সঙ্ঘচালক রবিকান্ত বর্মন, বিভাগ কার্যবাহ সুমন দত্ত, আরোগ্য ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি অমিয় কুমার মাহাত। স্মৃতিচারণ করেন স্থানীয় কার্যকর্তা ধীরেশ তালুকদার এবং এই দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন অমিয় কুমার মাহাত। উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালে মুরারীপুর সঙ্ঘস্থানে শাখা চলাকালীন সিপিএম-আরএসপি গুণ্ডাদের আক্রমণে প্রশান্ত মণ্ডল বীরগতিপ্রাপ্ত হন।

বাঙ্গালি মেয়ের কিংবদন্তী হবার কাহিনি

অনন্যা চক্রবর্তী

ফেমিনিজমের ধারণা যখন প্রথম পৃথিবীতে এল তখন বোধহয় কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে একদিন ফেমিনিজম পুরুষতন্ত্রেরই কপি ক্যাট হয়ে উঠবে। নিজের মতো করে বাঁচার পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে মেয়েরা ছেলেদের অনুকরণে রাস্তায় সিগারেট ফুঁকবে, ড্রাগ নেবে, মদ্যপান করবে— এমনকী, মূলত পুরুষদের বাজার ধরতে নামমাত্র পোশাক পরে বিজ্ঞাপনের মডেল হতেও রাজি হয়ে যাবে। ভাগ্যিস, আঠারো ও উনিশ শতকের বাঙ্গালি মেয়েরা ফেমিনিজম কথাটা শোনেননি। সাধারণ মেয়েদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। তারা তখন অশিক্ষা ও অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে। ইসলামিক অত্যাচার থেকে বাঁচতে ঠাঁই নিয়েছেন বাড়ির সব থেকে নিরাপদ কোণটিতে। কিন্তু যেসব মহিলা ইসলামি আগ্রাসন ও ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তাঁদের কাছে নারীশক্তির ধারণাটি ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো শক্তি প্রেমে। আঠারো-উনিশ শতকে যেসব বাঙ্গালি মহিলা বিদেশি ও বিধর্মী শাসকের বিরুদ্ধে অসমযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাদের কাছেও নারীশক্তির উৎস ছিল প্রেম, মানব প্রেম। পুরুষ তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সহযোগী মাত্র। এই নিবন্ধে আমরা আলোচনা করব এমনই তিন মহিলাকে নিয়ে।

রানি রাসমণির জল

কথাটা শুনলে ধাঁধার মতো লাগে। রানি রাসমণির জল মানে কি পানীয় জল? তিনি কি গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণার্ত মানুষকে পানীয় জল দেবার জন্য জলসত্র খুলেছিলেন? না, তা নয়। রানি রাসমণির জল কথাটির অর্থ শুনলে একবিংশ শতকের অতি আধুনিকাও লজ্জায় পড়বেন।

১৮৪০ সাল। দেশে তখন কোম্পানির শাসন। কিন্তু শাসকের দৃষ্টি যত না সাধারণ মানুষের সুখসমৃদ্ধির ওপর তার থেকে অনেক বেশি মুনাফা কামানোর ওপর নিবন্ধ। সোনে কি চিড়িয়া ভারতের যথাসর্বস্ব লুট করে ইংলন্ডে নিয়ে যেতে পারলেই তারা খুশি। এবার তাদের নজর পড়ল গঙ্গার ওপর। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রায় পুরোটা জুড়েই গঙ্গার উপস্থিতি। আর প্রতিদিন গঙ্গার বুকে জড়ো হয় মৎস্যজীবীদের ছোটো ছোটো অসংখ্য নৌকো। মাছ ধরাই তাদের জীবিকা। কোম্পানির নজর ওই গরিব মৎস্যজীবীদের ওপর। মাছ ধরার নৌকো চলাচলের ফলে গঙ্গায় ফেরি সার্ভিসের অসুবিধে হচ্ছে— এই অজুহাতে কোম্পানি তাদের ওপর অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দিল। উদ্দেশ্য, গঙ্গায় মাছ ধরা বন্ধ করা। মাথায় হাত পড়ল মৎস্যজীবীদের। একে তারা গরিব, তার

ওপর অতিরিক্ত খাজনার চাপ। এত টাকা তারা পাবে কোথায়? সেই সময় কলকাতার কোনও কোনও জমিদার সাধারণ মানুষের সেবায় নানারকম কাজ করতেন। গরিব মানুষগুলো প্রথমে হাজির হলো তাদের কাছে। কিন্তু কোনও লাভ হলো না। জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের বিধবা পত্নী রানি রাসমণির দানধ্যানের কথা তখন কলকাতার হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। তাঁর কাছে গেলে নাকি কেউ খালি হাতে ফেরে না! দূরদূরান্ত থেকে আসা সর্বস্বান্ত মানুষগুলো শেষ পর্যন্ত রানি রাসমণির শরণাপন্ন হলো।

এরপর যা ঘটল তাকে অষ্টাদশ শতকের মেয়েদের জীবনযাপনের নিরিখে ভেলকি বললেও কম বলা হয়। রানি রাসমণি দশ হাজার টাকার বিনিময়ে গঙ্গার দশ কিলোমিটার অঞ্চল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ইজারা নিলেন। তারপর দুটি বিশাল লোহার চেনের সাহায্যে নিজের ইজারা নেওয়া অংশটি ঘিরে ফেললেন। সেইসঙ্গে ঘোষণা করলেন যে ওই ঘেরা অংশে মৎস্যজীবীরা যত ইচ্ছে মাছ ধরতে পারে। কেউ তাদের বাধা দেবে না। লোহার চেন দিয়ে ঘেরা গঙ্গাই জনপ্রিয় হয়েছিল 'রাসমণির জল' নামে।

যাইহোক, এই ঘটনার ফল হলো মারাত্মক। কোম্পানির ফেরি সার্ভিসকে অপেক্ষা করতে হতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চেন খোলার হুকুম নেই। মাছ ধরা শেষ হবার পর চেন খোলা হতো। কোম্পানির কর্তারা রাসমণির জল পেরিয়ে যাবার অনুমতি পেতেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে মাথা নীচু করে দাঁড়াতে হতো এক অসমসাহসী বাঙ্গালি মহিলার কাছে। স্বাভাবিক ব্যাপার, ইংরেজরা এই ব্যাপার সহজে মেনে নেয়নি। কিন্তু রানি রাসমণি অন্য ধাতুতে গড়া। ভয় পাওয়ার পাত্রীই নন। কোম্পানির কর্তাদের তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চেন দিয়ে ঘিরে রাখা ছাড়া তাঁর অন্য কোনও উপায় নেই। এমনকী, ব্রিটিশ আইন উদ্ধৃত করে রাসমণি বলেন যে নিজের অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনে তিনি আদালতে যেতেও প্রস্তুত। এরপর ইংরেজরা মৎস্যজীবীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অতিরিক্ত খাজনা তুলে দিতে বাধ্য হয়। রানি রাসমণিকে আমরা সবাই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে জানি। কিন্তু তিনি শুধু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেননি, গরিব মৎস্যজীবীদের অধিকার রক্ষায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ কোম্পানি রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও নেমেছিলেন।

চুয়াড় রানি

নাম তাঁর শিরোমণি। কর্ণগড়ের সদগোপ বংশীয় জমিদার রাজা অজিত সিংহের (১৭৪৯) দ্বিতীয় পত্নী শিরোমণি। অজিত সিংহের মৃত্যুর

পর কর্ণগড়ের বিশাল জমিদারি পরিচালনার ভার শিরোমণির ওপর বর্তালো। চাইলে তিনি কর্ণগড়ের রানি হয়েই ভোগবিলাসের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা হলো না। এমন একটা ঘটনা ঘটল যা তাকে রাজপ্রাসাদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়ের বাইরে বেরোতে বাধ্য করল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে বাঙ্গলার সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত ছিল না। মুঘলদের কাছ থেকে বাঙ্গলার দেওয়ানি লাভ করা মাত্র কোম্পানি চড়া হারে খাজনা চাপিয়ে দিল। এর ফলে সাধারণ কৃষকেরা তো বটেই, অনেক ছোটো-ছোটো জমিদারও মুশকিলে পড়ল। খাজনা দিতে না পারার জন্য এবং সময়মতো খাজনা আদায় করে কোম্পানির কাছে জমা না করতে পারার জন্য এদের অনেকের জমি ও জমিদারি কোম্পানির হস্তগত হলো। এরকম পরিস্থিতিতে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবে কে? এগিয়ে এলেন রানি শিরোমণি। তিনি জানতেন যে বিদ্রোহীদের সম্মিলিত শক্তির থেকে কোম্পানির সেনাদের শক্তি অনেক বেশি। অর্থাৎ দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হলে ইংরেজরাই শেষ হাসি হাসবে। তার থেকেও বড়ো কথা, রানি শিরোমণি বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছেন— এই অজুহাতে ইংরেজরা কর্ণগড়ের সর্বনাশ করে ছাড়বে। এই পরিস্থিতিতে আজকের কোনও অতি আধুনিকা কী করবেন জানা নেই। তবে নিজের ভবিষ্যতের বারোটা বাজিয়ে স্বদেশ ও স্বজাতিকে সবার ওপরে রাখার সৎসাহস ক'জন দেখাতে পারবেন সে সন্দেহ থেকেই যায়।

রানি শিরোমণি অবশ্য ভবিষ্যতের কথা ভাবেননি। তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শুরু হয়েছিল চুয়াড় বিদ্রোহ। হাজার হাজার কৃষক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কোম্পানির অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে। রানি শিরোমণি নিজে তাঁর যোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি। ধরা পড়েছিলেন রানি এবং ১৮১২ সালে মারা যাবার দিন পর্যন্ত বন্দি ছিলেন আবাসগড় দুর্গে। চুয়াড় বিদ্রোহ সফল না হলেও রানি শিরোমণি এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

এক জননীর কাহিনি

নাটোরের রানি ভবানীর নাম অনেকেই শুনেছেন। তিনি ১০৮টি শিবমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। যার মধ্যে চার বাঙ্গলা মন্দির এখনও তাঁর শিবপ্রীতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। এছাড়া

সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য তিনি বহু রাস্তাঘাট ও পান্থশালাও নির্মাণ করিয়েছিলেন। রানি ভবানীর আর একটি বড়ো কাজ ১৭৭০ সালে যখন বাঙ্গলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলছে তখন ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবার প্রবর্তন। বিধবা বিবাহের উদ্যোগও তিনি নিয়েছিলেন কিন্তু সফল হননি।

তবে এসব এই নিবন্ধের আলোচনার বিষয় নয়। কীভাবে তিনি কিংবদন্তী হয়ে উঠলেন সে কথাই বলব। রানি ভবানী যখন নাটোরের জমিদারির ভার নিলেন তখন বাঙ্গলা-বিহার-ওড়িশার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা। লোকটা যেমন লম্পট তেমনই অত্যাচারী। রানি বুঝেছিলেন সময়মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে কিছুদিনের মধ্যেই আক্রান্ত হবে নাটোর। তাঁর এই আশঙ্কার কারণ মূলত দুটি : পরমাসুন্দরী কন্যা তারা এবং নাটোরের জমিদারির ক্রমবর্ধমান বার্ষিক আয়। রানি ভবানী দায়িত্ব নেবার পর জমিদারির বার্ষিক আয় বেড়ে ১৫ লক্ষ টাকা হয়েছিল। আর তারার ওপর সিরাজ-উদ-দৌলার কুনজরের কথাও অনেকে জানতেন। রানি নিজের সেনাবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই রানির আশঙ্কা সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। সিরাজ-উদ-দৌলার দূত নাটোরে এসে জানাল যে তারাকে কিছুদিনের জন্য মুর্শিদাবাদে পাঠাতে হবে। নবাবের সেরকমই হুকুম। স্বাভাবিক ভাবেই হুকুম অমান্য করলেন রানি। মা হয়ে কীভাবে তিনি একরত্তি মেয়েটাকে একটা রাক্ষসের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন! নবাবি সৈন্য আক্রমণ করল নাটোর। যুদ্ধ হলো দু'পক্ষের মধ্যে এবং রানি ভবানীর বীর যোদ্ধাদের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে হতমান নবাবি সৈন্য নাটোর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। সেইসময় একজন জমিদারের পক্ষে বাঙ্গলার নবাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সহজ কাজ ছিল না। বিশেষ করে জমিদার যেখানে একজন মহিলা। রানি ভবানী সেই কঠিন কাজ খুব সহজে করেছিলেন।

আজকাল মেয়েরা পুরুষের সমকক্ষ হতে চায়। ভাবতে চায় পুরুষের আচার-আচরণ অনুকরণ করলেই পুরুষের সমকক্ষ হওয়া যাবে। অথচ আমাদের তিন রানির কেউই পুরুষের সমকক্ষ হতে চাননি কিন্তু যা করেছেন তা সম্পূর্ণতই পুরুষের কাজ। এই পৌরুষ নারীত্বকে অপমান করে না। বরং অন্য এক পুরুষকারের সন্ধান দেয়। রবীন্দ্রনাথ নারীর এই পুরুষকারের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন 'বীর্যবতী' শব্দটি। এখনকার মেয়েদের বীর্যবতী হওয়া খুব প্রয়োজন। একমাত্র তাহলেই পুরুষের চোখে চিরশ্রদ্ধার আসন লাভ করবে মেয়েরা। □

শবনপুরের কল্যাণময়ী কল্যাণেশ্বরী

হীরক কর

বরাকর নদ যেখানে পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ডের সীমানা গড়েছে, সেখানে জাগ্রতা দেবী কল্যাণেশ্বরীর থান। ঠিক এই বঙ্গের অন্দরে হ্যাংলা পাহাড়ে ৫০০ বছরের প্রাচীন কল্যাণেশ্বরী মাতার মন্দির। জনশ্রুতি, কুষাণদের তাড়া খেয়ে তৃতীয় শতকে হরিপদ গুপ্ত পালিয়ে এসে রাজ্য গড়েন হ্যাংলা পাহাড়ে। তৎকালীন সময়ে এই জায়গার রাজা হরিপদ গুপ্ত মন্দির তৈরি করেন। পরবর্তীতে পঞ্চকোটের রাজা এই মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করেন। আপাদমস্তক সম্পূর্ণ মন্দিরই পাথরের ব্লক দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। নকশাবহুল নয় বরং সাধারণ মানের কারুকার্য খচিত মন্দিরের গায়ে চুন রঙের প্রলেপ পড়ে নৈপুণ্য গেছে ম্লান হয়ে। নীচু খিলানের উপর মোটা দেওয়াল ঘেরা অপ্রশস্ত মন্দিরে দ্রষ্টব্য একটি অতি প্রাচীন শক্তপোক্ত হাড়িকাঠ বা বলি স্তম্ভ। অতীতে নরবলির প্রথা ছিল দেবীর থানে। নরবলি না হলে নাকি পূজা সম্পূর্ণ হতো না। সে প্রাচীনকালের কথা, কালক্রমে অত্যাচারী ডাকাতদেরও সময় চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নরবলির জায়গায় পাঁঠাবলি শুরু হয়।

কথিত, ১২০০ বছরের পুরনো এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজা বল্লাল সেন। মন্দিরের প্রাচীন তথ্য থেকে জানা যায়, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কাপালিক দেবদাস চট্টোপাধ্যায় মা কালীর সাধনা করার জন্য এখানে আসেন। সেই সময় এই এলাকায় ছিল ঘন জঙ্গল। শোনা যায়, রাজা বল্লাল সেন ছিলেন ওই কাপালিকের ভক্ত। কাপালিকের নির্দেশ মেনেই তিনি অধুনা শবনপুরে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। সেখানেই বহু বছর আরাধনা হয় দেবী শ্যামারূপার। শবনপুরে জনবসতি গড়ে উঠলে দেবী নাকি কোলাহলে রুষ্ট হয়ে কল্যাণেশ্বরীতে একটি একফুট গভীর গর্তে আশ্রয় নেন। সেই থেকেই এখানে পূজিতা হচ্ছেন তিনি। পুজিত হয় একটি পাথরের ঢিবি। সিঁদুর, ফুল, চন্দন, লাল কাপড় দিয়ে সাজানো মা কল্যাণেশ্বরীর মূর্তি।

কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পাশ দিয়েই গিয়েছে বরাকর নদ। এই নদের উপরেই তৈরি হয়েছে

মাইথন ব্যারেজ। গড়ে উঠেছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। ১৯৫৭ সালে এই ব্যারেজ তৈরির পরিকল্পনা করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। এটি ছিল স্বাধীন ভারতের অন্যতম বড়ো উদ্যোগ। এর পরে এই অঞ্চলে আরও কয়েকটি ছোটো-বড়ো কলকারখানা গড়ে ওঠে। মন্দির ও জলাধারকে কাজে লাগিয়ে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়।

মাইথন জলাধার তৈরির সময় চালনাদহের ঘাটের পাথর জোর করে তুলতে নাকি এক সাহেবের মুখে রক্ত উঠেছিল। তারপরই সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। অতীতে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে। তাই, কল্যাণেশ্বরী দেবীর নামেই পরবর্তীতে মাইথন নামটি প্রচলিত হয়। মাইথন, অর্থাৎ মাই কা থান, সেখান থেকেই ছোটো হয়ে জায়গাটি মাইথন নামে প্রচলিত হয়।

এই মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়খণ্ড সীমান্তে বরাকর নদীর তীরে অবস্থিত। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের অধীন বিখ্যাত মাইথন বাঁধের থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মন্দিরটি একটি পর্যটন আকর্ষণ। অধুনা ২নং জাতীয় সড়কের থেকে মোটামুটি ১ কিলোমিটার। পুরনো গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর বরাকর শহর থেকে এই মন্দিরের দূরত্ব ৭ কিলোমিটার।

রাজা বল্লাল সেনের পালিতা কন্যার নাম ছিল লক্ষ্মী। পুরুলিয়ার কাশীপুরের রাজা কল্যাণীপ্রসাদের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় লক্ষ্মীর। কাশীপুরের রাজা বিবাহের যৌতুক হিসেবে দেবী

কল্যাণেশ্বরীকে পান। বিয়েতে যৌতুক হিসেবে মা শ্যামারূপার মূর্তি তুলে দেওয়া হয় নবদম্পতির হাতে। বিয়ের পর কুলটির স্বপ্নপুর গ্রামের কাছে জঙ্গলের মধ্যে দিকভ্রষ্ট হন নববিবাহিত দম্পতি। সেই জঙ্গলের মধ্যেই দেবী শ্যামারূপাকে নামিয়ে রাখেন কল্যাণীপ্রসাদ। সেই দিনটা পথ খুঁজতে খুঁজতেই কেটে যায়। পরের দিন রাস্তা খুঁজে পাওয়ার পর যখন কল্যাণীপ্রসাদ দেবীকে তুলতে আসেন, তখন শত চেষ্টাতেও দেবী শ্যামারূপাকে সেখান থেকে নড়ানো যায়নি।

দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পান। দেবী তাঁদের স্বপ্নে আদেশ দেন, এই মূর্তি এই নদীর পাশেই প্রতিষ্ঠা করতে। স্বপ্নপুরের সেই জঙ্গলেই দেবী শ্যামারূপার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কল্যাণীপ্রসাদ। তাঁর নামে দেবীর নাম হয় কল্যাণেশ্বরী। মানুষের মঙ্গলার্থে তিনি মা কল্যাণেশ্বরী নামে পুজো নেন। প্রত্যেকদিন সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত গড় জঙ্গলে ভোগ গ্রহণ করবেন। তারপর এখানে পুজো নেবেন।

সেই স্বপ্নপুর গ্রামই বর্তমানের শবনপুর। তার পরে শবনপুর এলাকায় দেবীর মন্দির তৈরি করা হয়। সবনপুর এলাকায় একটি মন্দিরের চিহ্ন এখনও রয়েছে। লোকশ্রুতি অনুসারে, প্রথমে সেখানেই বিরাজমান ছিলেন দেবী কল্যাণেশ্বরী। এই মন্দির পুরনো কল্যাণেশ্বরী মন্দির নামে পরিচিত। কথিত, প্রাচীন আমলে এই গ্রামের নাম ছিল স্বপ্নপুর। পরে তাই লোকমুখে শবনপুর-এ রূপান্তরিত হয়।

লোকমুখে প্রচলিত কাহিনি অনুসারে, শবনপুরের চারপাশে ছিল গ্রাম। সেখানে নাকি সারাদিন ধান থেকে চাল ও চিঁড়ে তৈরি করা হতো। ঢেঁকির আওয়াজে দেবী কল্যাণেশ্বরী বিরক্ত হয়ে কাশীপুর রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেন, তাঁকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে। দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজা নিকটবর্তী একটি জঙ্গলে দেবীর মন্দির স্থানান্তরিত করেন। পরে এই জঙ্গলকে ঘিরে সিদ্ধপীঠ গড়ে ওঠে। এই মন্দিরটিই আজ কল্যাণেশ্বরী মন্দির নামে পরিচিত। আজও এখানে এক ছোটো গুহার মধ্যে দেবীকে রাখা হয়। আর বাইরে রাখা হয়েছে অষ্টধাতুর দক্ষিণাকালী মূর্তি। এই কালীমূর্তিই মা কল্যাণেশ্বরী রূপে পূজিত হন। এই মূর্তিটি আসলে একটি গুহার বাইরের অংশ। দেওয়ালের ভিতরে গুহার মধ্যে আছে অষ্টধাতুর আসল দেবীমূর্তি। বলা হয়ে থাকে এই দেবীমূর্তি আসলে ইচ্ছাই ঘোষের পূজিত দেবী চণ্ডী। শ্যামারূপা মন্দিরের সঙ্গে এই দেবীমূর্তির একটা সম্পর্ক আছে। সেই কারণে শ্যামারূপা মন্দিরে সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পুজো হয়। আর দুপুর ১২টার পর ভোগ দেওয়া হয় কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে।

ইচ্ছাই ঘোষের আরাধ্য দেবী ছিলেন দুটি মা চণ্ডীর মূর্তি। একটি সোনার, অন্যটি অষ্টধাতুর। মা দুর্গার আশীর্বাদে ইচ্ছাই ঘোষের জন্ম হয়েছিল। সেই কারণে তিনি ছিলেন মা চণ্ডীর ভক্ত। এই ইচ্ছাই ঘোষ পরবর্তীকালে গড় জঙ্গলের রাজা হন।

একবার নাকি এক শাঁখারি সারাদিন চারিদিকে ঘোরার পরেও শাঁখা বিক্রি করতে না পেরে দেবীর মন্দিরের সামনে এসে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। জনশ্রুতি, তাঁর দুঃখ দেখে দেবী বালিকা রূপে তার কাছে এসে দুই হাতে শাঁখা পরে নেন। তিনি ওই শাঁখারিকে জানান, শবনপুর গ্রামে তাঁর বাবার কাছে গিয়ে শাঁখার পয়সা নিয়ে নিতে। এই কথা শুনে সেই ভদ্রলোক চমকে যান। তিনি বলেন, 'আমার তো কোনও কন্যা সন্তান নেই। তাহলে আমার নাম করে কে শাঁখা পরল?' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তিনি শাঁখারির সঙ্গে মন্দিরের দিকে রওনা হন। মন্দিরের সামনে গিয়ে ওই ব্যক্তি বলে ওঠেন, 'কোথায় আমার মেয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি না।' শাঁখারি বলে ওঠেন, 'কোথায় গেলে মা তুমি। একবার দেখা দাও। তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেবী কল্যাণেশ্বরী কন্যারূপে পাথরের চূড়ায় পিছন ঘুরে বসে শাঁখা পরা হাত দুটি তুলে দেখিয়ে দেন।

কয়েকদিন পর বরাকর নদীতে চুড়ি পরা মায়ের হাত রাজা এবং অনেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রাজা আবার মাকে দেখা দিতে বলাতে সেই মন্দিরের কাছে মা দেখা দিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হওয়ার সময় শঙ্কর আচার্যের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন দেবনাথ চ্যাটার্জি। পরবর্তীকালে দেবনাথ দেওঘরীয়া নামে পরিচিত হন তিনি। সাধনাতে সিদ্ধ লাভ করেন এবং তখনকার সময় বল্লাল সেন অর্থাৎ সেনবংশের কুলদেবী দুর্গাপুর গড়জঙ্গলে অবস্থিত মা শ্যামারূপা দেবনাথ দেওঘরীয়াকে স্বপ্ন দেন 'আমি আসছি আমি এলে এই আমার পদচিহ্ন থাকবে'। সেই পদচিহ্ন আজও মন্দির পরিসরে দেখতে পাওয়া যায়। মা জগতের কল্যাণ করেন, তাই মন্দিরের নাম হয় কল্যাণেশ্বরী। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ তাঁদের ইচ্ছা নিয়ে এখানে আসেন। যে নিমগাছের নীচে সাধক দেবনাথ সাধনা করেছিলেন, ভক্তরা সেই নিমগাছে পাথর বেঁধে মায়ের কাছে তাঁদের মঙ্গল কামনা করেন। মনোকামনা পূরণের পর ভক্তরা আবার প্রথমে মায়ের দর্শন করে। তারপর নিমগাছে বাঁধা পাথরটি খুলে নদীর জলে ফেলে দেন। আজও দেবীর শাঁখা আসে দামোদরের শাঁখারি পরিবার থেকে। রাজা বা রাজপাট না থাকলেও, এখনও রাজবাড়ি থেকেই পাঠানো হয় নৈবেদ্য। প্রায় ন'শো বছরের এই পুজোয় রাজার নামেই প্রথম সংকল্প করা হয়।

মন্দির চত্বরেই রয়েছে চতুর্দশ শিবমন্দির। শীতলা মায়ের থানে মনস্কামনা পূরণে ঢিল বাঁধার প্রথাও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির তৈরি হয়েছে কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের প্রবেশপথে। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিয়ে সামান্য দূরে অবস্থিত ভাণ্ডার পর্বতে ২৮৮ সিঁড়ি বেয়ে উপত্যকায় পৌঁছে সমগ্র কল্যাণেশ্বরী টাউন-সহ মাইথন দেখা একটি উপরি পাওনা। অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রায় সমান সিঁড়ি উঠে গেছে সবুজ ঘন জঙ্গল চিরে, ভোরের দিকে এতটাই নিস্তব্ধ পরিবেশ যে পিন পড়লেও আওয়াজ হবে। উপত্যকায় আছে একটি ছোটো শিবমন্দির। স্থানটি ধ্যান জপ করার পক্ষে আদর্শ।

এই মন্দিরের বয়স প্রায় ৪০০ বছর। এক সময় দুর্গম ছিল। জায়গাটা ছিল জঙ্গলে ঢাকা। জঙ্গলে বাঘের ভয়ে দিনের বেলায় আরতি হয়ে যেত। সেই পরম্পরা অব্যাহত রয়েছে। অন্য সময় সন্ধ্যা ৬টায় দরজা বন্ধ হলেও কালীপুজোয় সারারাত খোলা থাকে মন্দিরের দরজা।

বর্তমানে দেবীর মন্দিরে পঞ্চাশ জন সেবাইত রয়েছেন। দেবীর নিত্যপুজোর দায়িত্ব তাঁদেরই কাঁধে। এই এলাকায় মন্দির তৈরির পরেও একটি কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। সেবাইতের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে দেবী কল্যাণেশ্বরীর মন্দির ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে দু' থেকে আড়াই হাজার ভক্ত পুজো দিতে আসেন। বছরের অন্য মাসগুলিতে শনিবার ও মঙ্গলবার প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি ভক্তের সমাগম হয়। ফি-বছর দুর্গাপুজোর সময়ে নবমীর দিনে ধুমধামের সঙ্গে দেবীর পুজো হয়।

বিদেশি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কিছু বামপন্থী শিক্ষাবিদ নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছেন। বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হলে তাদের মৌরসিপাট্টা শেষ হবার আশঙ্কায় ভুগছেন।

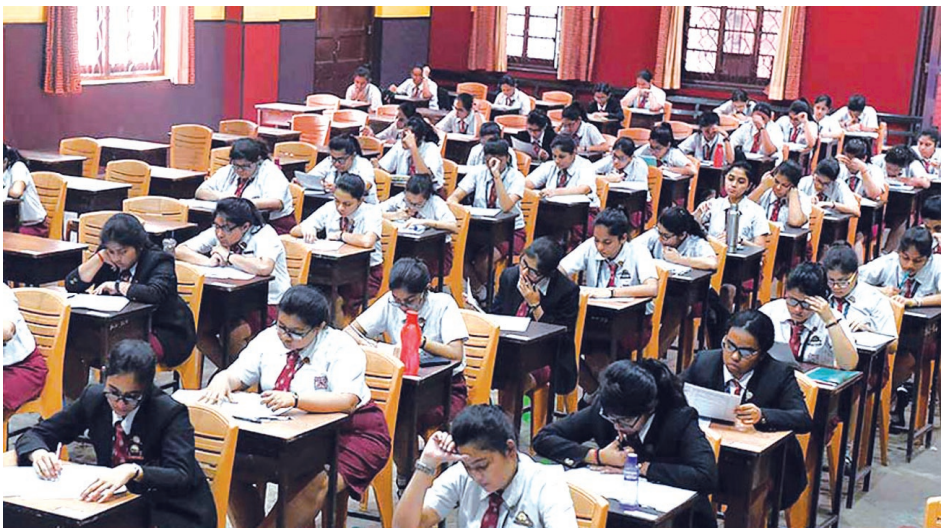

জাতীয় শিক্ষানীতির রূপায়ণ অবিলম্বে কার্যকর করা প্রয়োজন

আনন্দ মোহন দাস

দেশের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে দেশের মানুষকে বিশেষ করে যুব সমাজকে প্রকৃত শিক্ষিত করে তোলা যাবে না, বরং বিপথে পরিচালিত হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবে। ইতিমধ্যেই যার প্রতিফলন আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে দেখতে পাচ্ছি। ব্রিটিশের চক্রান্তে বিদেশি মেকলীয় শিক্ষা পদ্ধতি আজও দেশের মধ্যে বিদ্যমান। তিনি বলেছিলেন, 'পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এমন এক ভারতীয় গোষ্ঠী তৈরি হবে, যারা রক্তে, বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচি, মত, নৈতিকতায় ও বুদ্ধিমত্তায় হবে ইংরেজ। তারাই পরে জনগণের মধ্যে নতুন জ্ঞান প্রচার করবে এবং ইংরেজি শিক্ষার ফলে ভারতে নবজাগৃতি আসবে।' সহজেই অনুমেয় এর মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধকে ভুলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হলো। ভারতের আত্মা সব ভাষার জনক সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব হ্রাস করা হলো। আবহমানকাল ধরে যে সনাতন সংস্কৃতি দেশের মধ্যে প্রবহমান তার সমাপ্তি

ঘটানোর পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। গান্ধীজী বলেছেন, 'সংস্কৃত অধ্যয়ন না করলে কোনো ব্যক্তি প্রকৃত ভারতীয় এবং প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি বলে গণ্য হতে পারে না'। অথচ সেই সংস্কৃত ভাষাকে অপ্রচলিত আখ্যা দেওয়া হলো। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ছিলেন এই মেকলে শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকৃষ্ট ফসল। তাঁর কারণেই বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি মেকলে শিক্ষাপদ্ধতির অনুসারী। এই শিক্ষা পদ্ধতি কেবলমাত্র কেরানি তৈরি করতে পারে কিন্তু মানুষ তৈরি করতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ যে মানুষ তৈরির শিক্ষার কথা বলে গেছেন, আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় তার প্রতিফলন নেই। স্বামীজী বলে গেছেন, 'Education is the manifestation of perfection already in Man' অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা ইতিমধ্যে বিদ্যমান, তার বিকাশ সাধনই হলো শিক্ষা। তিনি বলেছিলেন, 'মানুষ চাই, আর সব হইয়া যাইবে' কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ হবার সুযোগ নেই। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত অথচ দেশের উপযোগী কোনো রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি আজও চালু হয়নি। শিক্ষা, সংস্কার ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে চালু করা একান্ত প্রয়োজন। একসময় ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বের কাছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। বর্তমানে তার করুণ অবস্থা। তক্ষশীলা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় যা তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বছর আগে। পঞ্চম শতাব্দীতে হুন আক্রমণে তা ধ্বংসে পর্যবসিত হয়েছে। বিক্রমশীলা, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর অন্যতম উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত ছিল যা দ্বাদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খিলজির

আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। এদেশেই আবির্ভূত হয়েছিলেন আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য, বরাহমিহির, চাণক্যের মতো বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ যাঁরা শিক্ষায় বিশ্ববিখ্যাত এবং এরাই বিশ্বকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছেন। বিদেশি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষা নীতির প্রবর্তনে আমরা দেশের বিকৃত ইতিহাস জেনেছি। বিদেশি শাসনে আমরা পরাজয় ও গ্লানির ইতিহাসে সমৃদ্ধ হয়েছি। আমাদের গৌরবময় বীরত্বের ইতিহাসের কথা বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানা রয়ে গেছে। বিদেশি ও বামপন্থী চক্রান্তে প্রকৃত ইতিহাস না লিখে ভারতীয়দের দুর্বল ও হীন জাতি হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। বিকৃত ইতিহাস দিয়ে দেশ ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা যায় না বরং হীনমন্যতায় ভরিয়ে তোলা যায়।

প্রাচীনকাল থেকে গুরুগৃহে বা আশ্রমে যে সার্বিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল আজ তা যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। সমাজে প্রকৃত মানুষ তৈরির শিক্ষাদানের অভাবে আজ মানুষ মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। পারস্পরিক বিদ্বেষ, হানাহানি, হিংসা, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ-সহ অনেক সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে। যে শিক্ষা মানুষকে বিনম্রতা শেখায় না, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শেখায় না, তা কোনো শিক্ষা নয়। রাজনৈতিক যূপকাষ্ঠে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বলি দিয়ে ক্যাডার তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকের দিনে যুব সমাজ বিভ্রান্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশীয় শিক্ষা নীতির পরিবর্তে পরানুবাদ ও পরানুকরণের বীজ বপন করা হয়েছে। ভারতীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির ধারক বাহক প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ও গীতার মাহাত্ম্যকে পাঠ্য পুস্তকে স্থান না দিয়ে মেকি ধর্ম নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে আমরা পাঠ্য পুস্তক থেকে বিষয়গুলি দূরে রেখেছি। অথচ বিদেশে বেশ কিছু দেশের উচ্চ শিক্ষার সিলেবাসে উপরিউক্ত ধর্মগ্রন্থগুলি গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমান দেশ ইন্দোনেশিয়ায় বহু পূর্বে তাদের পাঠ্যসূচিতে রামায়ণ মহাভারতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বর্তমান শিক্ষানীতির মাধ্যমে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার শংসাপত্র পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ তৈরি হয় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কথায় মানুষ হলো 'মান আর হুঁশ'। সেই 'হুঁশ' ফিরিয়ে আনার শিক্ষা চাই।

সাম্প্রতিককালে মুসলমান দেশ সৌদি আরব তাদের পাঠ্যসূচিতে রামায়ণ মহাভারতকে স্থান দিয়েছে। আমেরিকার নিউ জার্সির সেটন হল বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট কোর্সে গীতাকে পাঠ্যসূচিতে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে কিন্তু আমাদের দেশে এতদিন শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ধর্মগ্রন্থগুলির অনাদর হয়েছে। খুব আনন্দের বিয়ে, বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, উত্তরাখণ্ড-সহ বেশ কিছু রাজ্যে এই ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আমরা জানি শিক্ষা হলো জাতির মেরুদণ্ড এবং মনীষীরা বলেছেন, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো শিক্ষা ব্যবস্থায় আঘাত করা। বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত করে আদর্শ যুবসমাজ গঠন করা যায় না। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয় না, স্বদেশী ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে না, আত্মবিশ্বাসী হওয়ার প্রেরণা জোগায় না, স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হওয়ার বাসনা জাগায় না। স্বামীজী তাই বলেছেন, 'কয়েকটা পাশ করলে বা ভালো বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত হলো! যে বিদ্যার উন্মেষ ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা' (বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৭)। বর্তমান শিক্ষানীতির মাধ্যমে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার শংসাপত্র পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ তৈরি হয় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কথায় মানুষ হলো 'মান আর হুঁশ'। সেই 'হুঁশ' ফিরিয়ে আনার শিক্ষা চাই। দিব্যজ্ঞান শুধু নয়, কাণ্ডজ্ঞান চাই। শিক্ষার সঙ্গে সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রতিফলন চাই।

বহু আলোচনা ও গবেষণার পর অবশেষে উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়ে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি সংসদে পাশ হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন শিক্ষা নীতি চালু করতে সমস্ত রাজ্য সরকারগুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন কিন্তু কিছু বিরোধী শাসিত রাজ্য এই নতুন শিক্ষানীতি চালু করতে অনীহা প্রকাশ করেছে। কেউ কেউ রাজনীতি করতে শিক্ষায় গেরুয়াকরণের অভিযোগ তুলে নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। বিশেষ করে বিদেশি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কিছু বামপন্থী শিক্ষাবিদ নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছেন। বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হলে তাদের মৌরসিপাট্টা শেষ হবার আশঙ্কায় আশঙ্কিত তাঁরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও সমাজকে ভিত্তি করে এই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ভবিষ্যতে আমাদের আত্মনির্ভর করে তুলতে সাহায্য করবে। দায়বদ্ধতা, নমনীয়তা, গুণগত মানের শিক্ষা, বিজ্ঞানভিত্তিক সার্বিক মূল্যায়ন, প্রত্যেক শিশুর প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশের অনুকূল পরিবেশ রচনা, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণ, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের একত্রীকরণ হলো জাতীয় শিক্ষানীতির মূল ভিত্তি। এই নতুন শিক্ষা নীতির উপর ভিত্তি করে ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে এবং পশ্চিমি শিক্ষার অবসান ঘটবে। সেজন্য ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ ভুলে দেশ ও জাতির গঠনের জন্য অবিলম্বে দলমত নির্বিশেষে এই জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করার জন্য সকলের এগিয়ে আসা উচিত। □

বিনামূল্যে ওষুধ বিলি করে চলেছেন ৮৫ বছরের মেডিসিন বাবা

বিশেষ প্রতিনিধি॥ ''করোনা আমায় ঘায়েল করতে পারেনি। ওমিক্রনের ঝড়েও আমি সুস্থ ছিলাম। মানুষের সেবা করাই আমার একমাত্র পথ। সেই পথেই হাঁটব চিরকাল। কখনও থামিনি। আর থামবও না।''--- কথাগুলো বলছিলেন ৮৬ বছরের ওঙ্কারনাথ শর্মা। যিনি সারা ভারতে 'মেডিসিন বাবা' নামে পরিচিত। অবশ্য মেডিসিন বাবার খ্যাতি শুধু ভারতে নয়, এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু এমন কী করেছেন ওঙ্কারনাথ, যার জন্য দিল্লীর এই অশীতিপর বৃদ্ধের নাম বিশ্বের প্রথম সারির খবরের কাগজের শিরোনামে উঠে এসেছে! তা জানার জন্য ফিরে যেতে হবে ২০০৮ সালে। ওঙ্কারনাথ শর্মা তখন উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় একটি স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালের ব্লাডব্যাংকে কর্মরত। সেই সময় দিল্লির লক্ষ্মীনগর মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি নির্মীয়মাণ ব্রিজ ভেঙে শ্রমিক ও পথচারীদের মৃত্যু হয়। আহত হন অসংখ্য মানুষ। স্থানীয় হাসপাতালগুলি আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেই ছেড়ে দিচ্ছিল। প্রাইভেট হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা করানোর সামর্থ আহতদের ছিল না। বাড়ি ফেরার পর আহতের মধ্যে অনেকের মৃত্যু হয়। অনেকের কাছে ওষুধ কেনার মতোও টাকা ছিল না। এই ঘটনা ওঙ্কারনাথের মনে ঝড় তুলেছিল। ওঙ্কারনাথ ঠিক করলেন, এবার থেকে তিনি ওষুধ জোগাড় করবেন। যাদের প্রয়োজন আছে, তাঁদের হাতে সেই ওষুধ তুলে দেবেন।

তারপর থেকে দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে তিনি ওষুধ সংগ্রহ করে চলেছেন। পায়ে চোট থাকা সত্ত্বেও বাড়ি থেকে ৫ কিলোমিটারের মধ্যে প্রতিদিন হেঁটে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাড়তি ওষুধ জোগাড় করেন। বাড়িতে তাঁর ৪৫ বছরের মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলে, সংসারের টানাপোড়েন—কোনও কিছুই ওঙ্কারনাথকে টলাতে পারেনি। তাই লোকে তাঁর নাম দিয়েছে 'মেডিসিন বাবা'। আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল হোক বা নিউ ইয়র্ক টাইমস এমন কোনও সংবাদমাধ্যম নেই যেখানে মেডিসিন বাবার নামে খবর বেরোয়নি। এখনও পর্যন্ত ৬৫ টা দেশের সংবাদ মাধ্যম মেডিসিন বাবার সম্পর্কে খবর প্রকাশ করেছে।

মেডিসিন বাবার এমন প্রশংসনীয় মানবিক কর্মযজ্ঞকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে উত্তর প্রদেশ-বিহারে স্কুলের পাঠ্য বইয়ে তাঁর সম্পর্কে পড়ানো হয়। সম্প্রতি ছত্তিশগড়ের দশম শ্রেণীর ইংরেজি বইতেও মেডিসিন বাবাকে নিয়ে একটা অধ্যায় রেখেছে সেরাজ্যের সরকার। এতে ওঙ্কারনাথের কাজে একটু সুবিধে হয়েছে বৈকি। বিভিন্ন দেশ থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে মানুষ তাঁর ঠিকানায় ওষুধ পাঠিয়ে দেন। ওষুধ চেয়েও তাঁর কাছে প্রচুর চিঠি, ফোন, মেসেজ আসে। তাঁদের আবার কুরিয়ার করে ওষুধ পাঠাতে হয়। ওঙ্কারনাথ জানান, 'অনেক ভালো মানুষ আছেন, যাঁরা ওষুধগুলো কুরিয়ার করে দেন তাঁদের টাকা দিয়ে। এতে আমার একটু সুরাহা হয়।' একথা বলতে গিয়ে একটি ছোট ঘটনা তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, ''একবার বিদেশ থেকে পাঁচশোটা ইউরিন ব্যাগ এলো। একজন ফোন করে বললেন, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের জন্য হাজার দুয়েক টাকা দিতে হবে। আমি বললাম একটা টাকাও নেই আমার কাছে। যেখান থেকে এসেছে সেখানেই পাঠিয়ে দাও। তিন মাস পর আবার ফোন এলো। বললেন, আপনার জিনিস এসেছে। কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সও হয়ে গেছে। এসে নিয়ে যান।'' অবসরের পর অনেক সময় বাড়িতে খাবার বাড়ন্ত হতো ওঙ্কারনাথের। তখন কেউ কেউ চাল-ডাল-সবজি কিনে বাড়িতে পৌঁছে দিতেন।

পরনে গেরুয়া পাঞ্জাবি। তাতে ছাপানো একটা মোবাইল নম্বর। লেখা, 'ভ্রাম্যমান ওষুধ ব্যাংক'। কাঁধে একটা ঝোলা। আর হাতে মাইক। কারও বাড়িতে বাড়তি ওষুধ থাকলে সেগুলো চেয়ে নেন মেডিসিন বাবা। সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ৩টে অবধি চলে তাঁর ওষুধ সংগ্রহ । ঝোলায় তাঁর ভর্তি ওষুধ। যাঁর যেমন প্রয়োজন তাঁকে বিলি করেন। সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক।

বর্তমানে 'মেডিসিন বাবা ফাউন্ডেশন' নামে একটা সংস্থাও গড়েছেন ওঙ্কারনাথ। ওষুধ মজুত করার জন্য একটা গোডাউনও করেছেন। ৮৬ বছরেও ক্লান্ত হন না ওঙ্কারনাথ। তাঁর এই অসামান্য প্রয়াসের জন্য 'দিল্লি গৌরব পুরস্কার' এবং 'সুরবীর পুরস্কার'-এ সম্মানীত হয়েছেন তিনি। □

অস্কার মঞ্চে ভারতীয় চলচ্চিত্রের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়

ড. সমর সরকার

স্টেশন— বিভূতিভূষণ হল্ট। বনগাঁর ঠিক আগের স্টেশন। ১৪ মার্চ ২০২৩। ঘড়িতে তখন সকাল ১০টা বেজে ৪৭ মিনিট, জানলার বাইরে চোখ রাখলাম। এই স্টেশন আগে ছিল না, পরবর্তীকালে তৈরি হয়। বনগাঁ আমার জন্মমাটি। ১০ মাস ১০ দিন গর্ভে ধারণ করে আমার মাতৃদেবী আমাকে বনগাঁ হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন। হঠাৎ কেন এই লেখা লিখতে গেলাম; কেননা ১২ মার্চ ২০২৩ অস্কার মঞ্চে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জয়জয়কার। যা আমরা ১৩ মার্চ জানতে পারি। ভারতবাসী হিসেবে গর্বিত হই ও গর্বে চোখের কোণায় আনন্দাশ্রু বইতে থাকে।

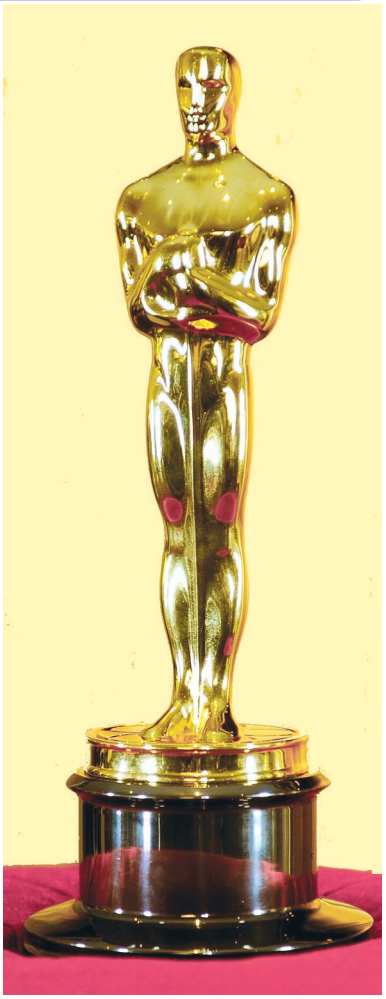

১৯৫৫ সালের আগস্টের শেষে আর সেপ্টেম্বরের শুরুতে শুধু বাংলা চলচ্চিত্রই নয়, বিশ্বচলচ্চিত্রের পুরো কাঠামো বদলের ঘটনা ঘটে সত্যজিৎ রায়ের কুশলী পরিচালনায়। ১৯২৯ সালে নন্দিত কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমাদৃত প্রথম দক্ষিণ এশীয় চলচ্চিত্রের মর্যাদা লাভ করে, যা পরবর্তীতে পরিণত হয় সর্বকালের অন্যতম সেরা চলচ্চিত্রে। 'পথের পাঁচালী'কে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার আগে সিনেমা বলতে বোঝাত সুনির্দিষ্ট প্লট, চরিত্র, ক্লাইম্যাক্স প্রভৃতির মাধ্যমে দর্শকের সামনে একটি আকর্ষণীয় কাহিনি তুলে ধরা। সত্যজিৎ রায়ের হাতে 'পথের পাঁচালী' বাংলা তথা ভারতের প্রথম ছবি যেখানে গ্রাম বাঙ্গলার এক দরিদ্র পরিবারের চলমান জীবনকে নিটোল বাঁধনে জীবন্ত রূপ দেওয়া হয়েছে।

চিরায়ত বাঙ্গলার অপরূপ আনন্দ-বেদনার আখ্যানে যে উপন্যাস রচনা করেন বিভূতিভূষণ, সত্যজিৎ রায় সেলুলয়েডের মাধ্যমে তাকে নান্দনিক সুষমায় উদ্ভাসিত করেন। কাহিনির সময়কাল বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক। স্থান নিশ্চিন্দিপুর নামক পশ্চিমবঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল। প্রধান চরিত্র অপু ও তার পরিবারের জীবনযাত্রার কথাই 'পথের পাঁচালী'র মুখ্য বিষয়।

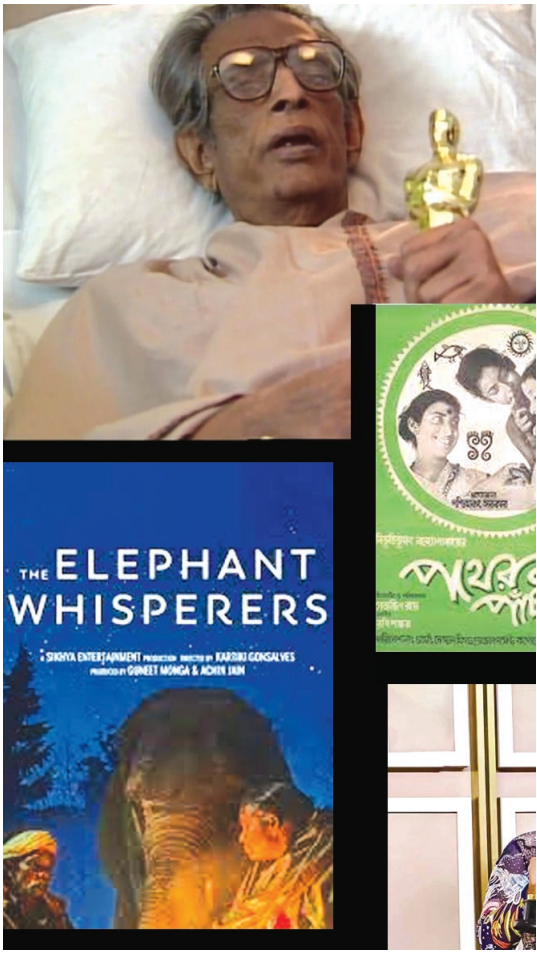

বিশ্বনাগরিক, ভারতীয় বোধ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ, আদ্যোপান্ত বাঙ্গালি এই মহান পরিচালকের সৃষ্টিশীল কাজ বাঙ্গালি তথা ভারতীয় তথা বিশ্ব জনমানসে বেঁচে থাকবে চিরকাল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ভারতীয় ছবিতে নয়, হলিউডি ছবিতে কাজ করে অস্কার পেয়েছেন এই তালিকায় আছেন বেশ কয়েকজন ভারতীয়। সবার প্রথম কিংবদন্তী কস্টিউম ডিজাইনার শিল্পী শ্রীমতী ভানু আথাইয়া। ১৯৮২ সালে 'গান্ধী' ছবিতে পোশাক পরিকল্পনার (কস্টিউম ডিজাইন) কাজ করে অস্কার জিতে নেন তিনি। একদিক থেকে তিনিই প্রথম ভারতীয় অস্কার বিজয়ী। ২০০৯ সালে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ও সংগীত পরিচালক এ আর রহমান এবং প্রখ্যাত গীতিকার গুলজার 'স্লামডগ

মিলিয়েনিয়ার' ছবির 'জয় হো' গানের জন্য সেরার শিরোপা পেয়েছিলেন। ২০০৯ সালেই রসুল পুকুট্টি ওই একই ছবিতে সাউন্ড মিক্সিংয়ের জন্য শিরোপা পেয়েছেন। ২০২৩ সালে কার্তিকী গঞ্জালভেস 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স' ছবির জন্য সেরা স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র বিভাগে শিরোপা পান। ২০২৩ সালে এমএম কিরাভানি ও চন্দ্র বোস 'আর আর আর' ছবির 'নাটু নাটু' মৌলিক গানের জন্য শিরোপা পেয়েছেন। ৯৫তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড তথা অস্কারের মঞ্চে ভারতের জয়জয়কার।

অনাথ হাতির সঙ্গে তার পালকদের সম্পর্কের অটুট বন্ধন ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স'-এর পটভূমি। শিক্ষা এন্টারটেইনমেন্টের গুণীত মোঙ্গা এবং অচিন জৈন প্রযোজিত এই তথ্যচিত্রের কেন্দ্রে আছেন দক্ষিণ ভারতীয় দম্পতি রোম্মান ও বেলি। অনাথ হস্তীশাবক রঘুর ভরণপোষণের জন্য জীবনপণ করতেও রাজি এই দম্পতি। এই চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে মানুষ এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের পবিত্র বন্ধন। বলা হয়েছে জনজাতি সম্প্রদায়ের সম্মানের কথা, জনজাতি এবং বন্য জীবের মেলবন্ধন ও সহাবস্থানের কথা। সুরম্য মুদুমালাই জাতীয় উদ্যানে শুটিং হয়েছে তথ্যচিত্রটির।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও পরিচালক ভি. বিজয়েন্দ্র প্রসাদের ১৩ মার্চ টিভি ইন্টারভিউ থেকে জানতে পারলাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বলেছিলেন 'How can we bring into glory?' প্রধানমন্ত্রী সমস্ত বিষয়ে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করেন। ঠিক যেমন CSIR Director-কে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন কোভিড ভ্যাকসিন ভারতবর্ষে যাতে তৈরি করা যায়। এর পরের ইতিহাস সবার জানা। 'It surprises the entire world and India proves humanity showed from a spiritual country by supplying covid vaccine to more than 100 courtries'।

২০২৩-র এই পুরস্কার চিত্রনাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, চিত্রশিল্পী, প্রযোজক, গীতিকার সবাইকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং আগামীদিনে অস্কার মঞ্চে ভারতীয়দের দাপাদাপি বহুলাংশে বেড়ে যাবে একজন ভারতীয় হিসেবে এই আশা রাখি।

(লেখক অধ্যাপক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা)

ধুন্ধুবধ

শ্রাবস্তীর রাজা বৃহদশ্বেরের পুত্রের নাম কুবলাশ্ব। এই কুবলাশ্ব ধুন্ধু নামে এক দৈত্যকে বধ করে ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বহুদিন রাজত্ব করার পর বৃদ্ধ হয়ে পড়লে রাজা বৃহদশ্ব পুত্র কুবলাশ্বর হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে বানপ্রস্থে যাওয়ার মনস্থ করলেন। এরপর কুবলাশ্বর অভিষেক করে তিনি যখন বনে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন তখন একদিন উত্তঙ্ক নামে এক ঋষি বৃহদশ্বের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, আপনার কাছে আমার কিছু নিবেদন আছে।

বৃহদশ্ব যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ঋষিকে আপ্যায়ন জানিয়ে বললেন, আদেশ করুন ঋষিবর।

উত্তঙ্ক বললেন, মহারাজ, সমুদ্রের পাশেই যে বিরাট বালুকাময় প্রান্তর আছে, সেই প্রান্তরে পাশেই আমার আশ্রম। কিন্তু সেখানে আমি নিশ্চিন্তে জপ-তপ করতে পারছি না।

বৃহদশ্ব বললেন, কেন মুনিবর? আপনার জপ-তপে কি কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করছে?

উত্তঙ্ক বললেন, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন মহারাজ। সমুদ্রের বেলাভূমির বিস্তীর্ণ বালুস্তূপের ভিতরে মধু রাক্ষসের পুত্র ধুন্ধু বাস করে। বহুবছর তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে দেব-দানব, যক্ষ-গন্ধর্ব, নাগ-রাক্ষস — সকলের অবধ্য এই ধুন্ধু। এক বছর বালুকারশির মধ্যে আত্মগোপন করে থাকার পর যখন জেগে ওঠে তখন তার ভীষণ নিঃশ্বাসে বেলাভূমিতে প্রচণ্ড ঝড়ের সৃষ্টি হয়। সেই সময় জপ-তপের, যজ্ঞের কী নিদারুণ বাধা হয় তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারবেন মহারাজ!

বৃহদশ্ব বসলেন, এই অবস্থায় আমি কী করতে পারি ঋষিবর?

উত্তঙ্ক বললেন, মহারাজ, আপনি লোককল্যাণের জন্য ওই রাক্ষসকে বধ করুন, আপনি ছাড়া ওই রাক্ষসকে কেউ বধ করতে পারবে না। আমি আপনাকে আমার তপস্যার তেজ দান করব। কারণ ভগবান বিষ্ণু আমাকে বর দেবার সময় বলেছিলেন যে যিনি ধুন্ধুকে বধ করতে রাজি হবেন বিষ্ণু তাকে তাঁর তেজ দান করে শক্তিশালী করে তুলবেন।

ঋষি উত্তঙ্কের কথা শুনে বৃহদশ্ব পুত্র কুবলাশ্বকে ডেকে বললেন, বৎস, আমি যে বানপ্রস্থে যাব মনস্থ করেছি তা তুমি জান আর আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করব না। তুমিই ধুন্ধুকে হত্যা করে ওই জনপদের কল্যাণ কর। এই বলে তিনি তপস্যার জন্য বনে চলে গেলেন।

তখন কুবলাশ্ব পিতার আদেশ মতো ধুন্ধু রাক্ষসকে বধ করার জন্য তার একশত পুত্রকে নিয়ে সেই বালুকাময় মরুভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। ঋষি উত্তঙ্ক তখন শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করে বিনীত প্রার্থনা জানালে শ্রীবিষ্ণু কুবলাশ্বর দেহে প্রবেশ করে তার শক্তি ও তেজ বৃদ্ধি করে দিলেন।

এরপর কুবলাশ্ব তার পুত্রদের আদেশ দিলেন, বৎসগণ! তোমরা সকলে মিলে এই বালুকাময় প্রান্তর খুঁড়তে আরম্ভ কর।

কুবলাশ্ব-পুত্ররা প্রচণ্ড উৎসাহে মাটি খুঁড়তে শুরু করে দিল এবং একসময় তারা ধুন্ধুর আত্মগোপনের স্থান খুঁজে পেয়ে তাকে আক্রমণ করল।

ধুন্ধুও প্রচণ্ড ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে কুবলাশ্বর পুত্রদের আক্রমণ করল। আর তাদের গ্রাস করতে থাকল।

একে একে নব্বইটি পুত্রকে গ্রাস করার পর ধুন্ধু সবেগে কুবলাশ্বর দিকে ধাবিত হতেই কুবলাশ্ব বিপুল তেজে প্রতিআক্রমণ করলেন। ফলে ধুন্ধু হীনবল হয়ে কুবলাশ্বর হাতে প্রাণ হারাল।

ধুন্ধু নিহত হলে উত্তঙ্ক ঋষি পরম আনন্দে কুবলাশ্বকে নানারকম বর দান করলেন। আর সেদিন থেকে কুবলাশ্ব ধুন্ধুমার নামে পরিচিত হলেন। পরে উত্তঙ্ক ঋষির তপস্যার প্রভাবে কুবলাশ্বের নিহত পুত্রেরাও স্বর্গে গমন করলেন।

শ্যামাপদ সরকার

ভারতের বিপ্লবী

মৃণাল দেবী

স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ জেলার এক ব্যক্তিত্বময়ী নারী ছিলেন মৃণাল দেবী। তিনি রঘুনাথপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন জঙ্গিপুর কোর্টের উকিল। বাল্যবয়সেই মৃণাল দেবীর বিয়ে হয় বিপ্লবী বাঘা যতীনের এক আত্মীয়ের সঙ্গে। জেলবন্দি বিপ্লবীদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদে মৃণাল দেবী টানা ৩৯ দিন অনশন করেন। কলকাতার একটি জনসভায় পুলিশের হাত থেকে একজনকে বাঁচাতে গিয়ে পুলিশের বেয়নটের খোঁচায় তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৪ দিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখে। ১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু রঘুনাথগঞ্জে তাঁদের বাড়িতে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। ১৯৮২ সালে ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কি?

- বেদকে হিন্দুদের প্রথম ইতিহাস ও ধর্মীয় গ্রন্থ বলা হয়।
- বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ । বেদের অর্থ হলো জ্ঞান। বেদ চারভাগে বিভক্ত ।
- ঋকবেদে রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান রয়েছে।
- যজুর্বেদ দু'ভাগে বিভক্ত— কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ। সমস্ত যজ্ঞের মন্ত্র ও বিধি রয়েছে।
- সামবেদে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের বিবরণ রয়েছে।
- অথর্ববেদ আয়ুর্বেদ জ্ঞানের ভাণ্ডার।

ভালো কথা

রামমন্দির

গত মাসে আমরা সপরিবারে মথুরা, বৃন্দাবন ঘুরে অযোধ্যায় গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা রামদরবার, হনুমানগড়ি মন্দির দেখলাম। ওখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মন্দির তৈরির কাজ চলছে। আমরা দূর থেকে দেখলাম। বাবা বললেন, ওখানে রামজন্মভূমি মন্দির তৈরি হচ্ছে। পুরনো মন্দির ভেঙে বাবর মসজিদ তৈরি করেছিল। তারজন্য অনেক লড়াই হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মমলা চলেছে। লড়াই হয়েছে। কলকাতার দুইভাই রাম কোঠারী ও শরদ কোঠারী প্রাণ বলিদান দিয়েছে। তারপর ২০১৯ সালে আদালতের রায়ে ওখানে মন্দির তৈরি শুরু হয়েছে। ওখানেই আমরা শুনলাম, আগামী বছর মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন হবে। বাবা বললেন, তখন আবার আমরা অযোধ্যায় আসবো।

স্নেহা মজুমদার, নবম শ্রেণী, ডালখোলা, উঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

মধুর খোঁজে

বিদিশা পাল, একাদশ শ্রেণী, ব্যারেজ কলোনি, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

আমাদের অঙ্গনে
একফালি বাগানে
ফুটেছে অনেক ফুল,
তারই সাথে আমগাছে
রাশি রাশি ফুটেছে
গাছভরা আমের বোল।

সকাল দুপুর বিকাল
মৌমাছি গুন গুন
খুঁজে খুঁজে ফেরে মধু,
তারই খোঁজে পাখিগুলি
করে শুধু ডাকাডাকি
পায় না একটুও তবু।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

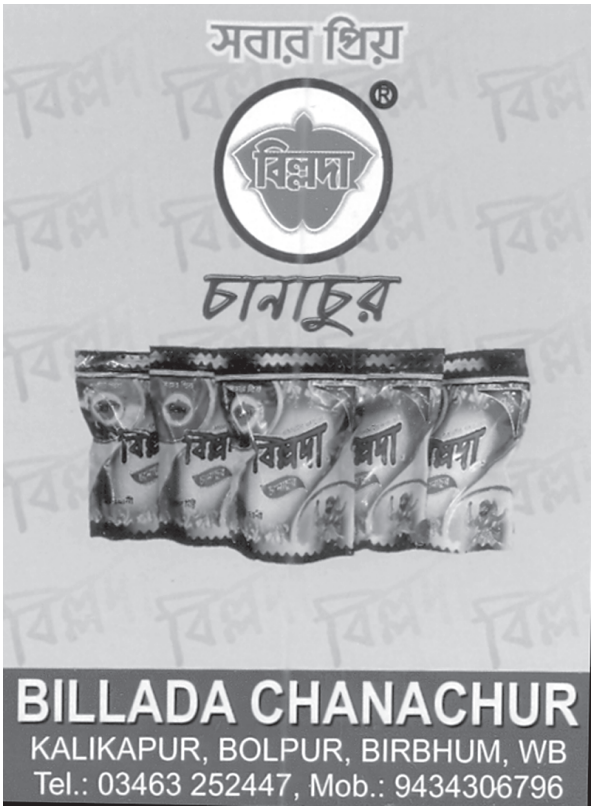

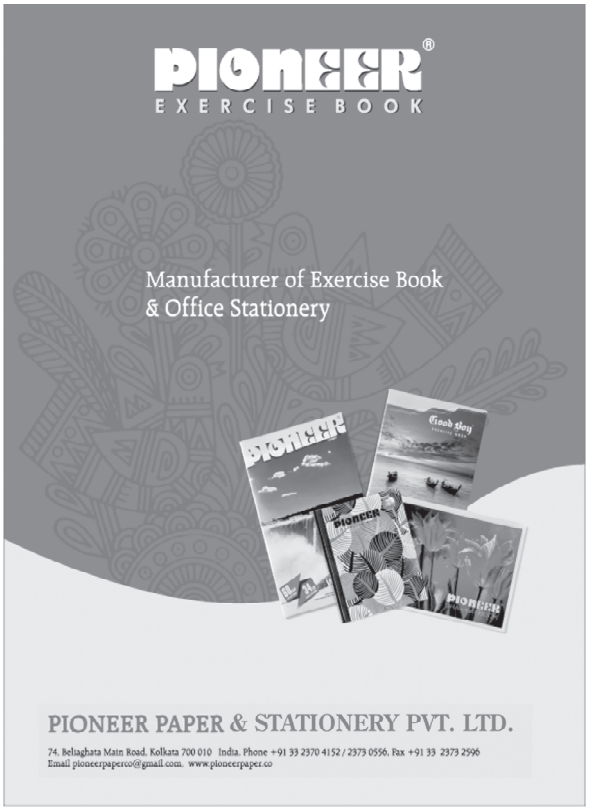

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

মুর্শিদাবাদে জনবিন্যাস বদলে যাওয়ার এক ধারাবাহিক ইতিহাস

বিনয়ভূষণ দাশ

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও জেলায় প্রতিনিয়ত জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম জনগণনা হয়। সেই থেকে প্রতিটি জনগণনার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা দেশের ধর্মীয় জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে। হিন্দু জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা দেশে শতকরা হিসেবে কমে যাচ্ছে; অন্যদিকে মুসলমানদের শতকরা জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে প্রতিটি জনগণনায়। দেশভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিই হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় বিভাজনের কারণে; ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে। হিন্দু বাঙ্গালি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি করেছে। ব্রিটিশ সরকার 'দেশবিভাগ প্রস্তাব' ঘোষণার পরে পরেই ইংরেজি দি অমৃত বাজার পত্রিকা 'দেশবিভাগ' প্রস্তাবের উপর পাঠকদের মতামত জানতে চেয়ে একটি প্রশ্ন ধারাবাহিকভাবে পত্রিকার পাঠকদের সামনে উত্থাপন করে। প্রশ্নটি হলো, 'Do you want a separate homeland for Bengal! Hindus? মাঝে দু-তিন দিন বাদ দিয়ে ২৩ মার্চ, ১৯৪৭ থেকে ১৫ এপ্রিল, ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রতিদিন এটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার ওই বিশেষ সমীক্ষার ফলাফল ২৩ এপ্রিল, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মোট ৫,৩৪,২৪৯ জন ওই সমীক্ষায় তাঁদের মতামত জানান। এঁদের মধ্যে প্রস্তাবের পক্ষে মতামত জানান ৯৮.৩ শতাংশ, বিপক্ষে মত দেন ০.৬ শতাংশ এবং কোনো পক্ষেই না-এর দলে ছিলেন ১.১ শতাংশ।

এছাড়াও হিন্দু বাঙ্গালির 'স্বতন্ত্র বাসভূমি'র স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক ড. শিশির কুমার মিত্র ও অন্যান্য বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী যেমন, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী, বৈজ্ঞানিক ড. মেঘনাদ সাহা, ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষরিত একটি প্রস্তাব ৭ মে, ১৯৪৭ ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রসচিবকে প্রেরণ করা হয়। এই সমস্ত প্রস্তাব এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বতন্ত্র হিন্দু বাসভূমি আন্দোলনের ফলেই হিন্দু বাঙ্গালির স্বতন্ত্র বাসভূমি, পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হয়। আর মুর্শিদাবাদ জেলা 'র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের' কল্যাণে তিনদিন পূর্ব পাকিস্তানে থাকলেও জেলার হিন্দু জমিদার, সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, কান্দির রাজা বিমলচন্দ্র সিংহ এবং সর্বোপরি ড. শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টায় এই জেলা

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। জনসংখ্যার ধর্মীয় বিন্যাসের সমস্যাটি পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণ সমস্যা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক— এঁরা কেউই এই সমস্যাটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা, সম্যক উপলব্ধি করা— কোনোটিই করতে চান না। জনবিন্যাসের ধর্মীয় কারণের ফলে দেশের একটি বড়ো অংশ বিদেশ হয়ে যেতে পারে এঁরা দেখেও তা দেখতে ও বুঝতে চান না। উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজেই এঁরা সমস্যা এড়াতে চান। ধর্মীয় জনবিন্যাসের এই সমস্যাটি সম্যকভাবে বুঝতে সুবিধে হবে যদি আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার জনবিন্যাসের বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করি। প্রাক-স্বাধীনতার সময় থেকেই মুর্শিদাবাদ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। তখন, অর্থাৎ ১৯৪৭-এ মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলমান সংখ্যা ছিল ৫৫ শতাংশ; আর ২০১১-এর জনগণনায় এই সংখ্যা পৌঁছে গেছে ৬৬.২৭ শতাংশে। স্মর্তব্য যে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হিসেবে আরও দুটি জেলা— মালদহ ও উত্তর দিনাজপুর জেলা উঠে এসেছে। শেষোক্ত উত্তর দিনাজপুর জেলা ২০০১ খ্রিস্টাব্দেও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলা কিন্তু একসময় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল। যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী বলেন, হিন্দুরা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠই থাকবেন, তাঁদের মুর্শিদাবাদের জনবিন্যাসের ইতিহাসটি ভালো করে জানা প্রয়োজন। একটি জেলা বা একটি অঞ্চল কীভাবে ধীরে ধীরে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা থেকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় পরিণত হয়ে যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মুর্শিদাবাদ জেলা। আর এর অবধারিত ফল হলো, জেলার সমাজজীবনে অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া এবং জেলার মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চল থেকে হিন্দুদের ধারাবাহিক উদ্‌বাসন বা displacement। গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের জমি জবরদখল, বাম আমলে বর্গাদারি প্রথার ফলে ব্যাপকভাবে হিন্দুদের জমি মুসলমানদের হাতে হস্তান্তরিত হওয়া, ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করা, হিন্দু মেয়েদের জোরপূর্বক অপহরণ ইত্যাদি ঘটনা গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে এ সমস্ত ঘটনা আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে জেলার তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ মদতে। জেলা সদর বহরমপুর শহর ও তার আশপাশের অঞ্চলও এ ধরনের ঘটনার বাইরে নয়।

এবারে জেলার বদলে যাওয়া জনবিন্যাসের ধারাটি একটু বিশ্লেষণ করা যাক। ভারতবর্ষে প্রথম জনগণনা শুরু হয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। ওই জনগণনা অনুযায়ী জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩১০ জন এবং মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ১২ হাজার ৮২২ জন; হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ১.৭৮ : ১.০০, অর্থাৎ জেলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এর আগে, ১৮৫২ থেকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জে ই গ্যাসট্রেল রেভিনিউ সার্ভের সময় জেলার জনসংখ্যা এগারো লক্ষ আশি জন বলে নির্ধারিত করেছিলেন। তার মধ্যে সাত লক্ষ চার হাজার সাতশো সতেরো জন ছিলেন হিন্দু আর তিন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার তিনশো তেষট্টি জন মুসলমান। এই রিপোর্টটি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গলা সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ন' বছর পরে, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় জনগণনার সময় জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল বারো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশো নব্বই জন। এর মধ্যে ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৯৬ জন, অর্থাৎ ৫১.৭৪ শতাংশ হিন্দু এবং ৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯৫৭ জন বা ৪৮.০৮ শতাংশ মুসলমান; অর্থাৎ তখনও হিন্দুরা মুর্শিদাবাদ জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন।

'ধর্মনিরপেক্ষবাদিতার' মুখোশ থেকে রাজ্যের রাজনীতিবিদ ও অ্যাকাডেমিক বুদ্ধিজীবীদের বেরিয়ে আসতে হবে। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সমস্যাটি অনুধাবন করতে হবে এবং রাজ্যটিকে আরও একটি 'বাংলাদেশ' হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ তৃতীয় জনগণনার সময় ওই জনসংখ্যা বেড়ে হয় ১২ লক্ষ ৫০ হাজার ৯ শত ৪৬ জন। এই ১৮৯১ সালের জনগণনার ধর্মভিত্তিক পরিসংখ্যান হলো, হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা সংখ্যা ছিল ৪৯.৬ শতাংশ এবং মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা সংখ্যা ৪৯.৫ শতাংশ। অর্থাৎ তখনও প্রান্তিকভাবে হলেও হিন্দুরা জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এর পরের জনগণনা অনুষ্ঠিত হয় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে। এই বছরের জনগণনায় জেলার মোট জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩,৩৩,১৮৪ জন (১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৮৪ জন)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি জনগণনায় জেলার জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। জেলার হিন্দু জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬,৪৪,১৯২ জনে, আর মুসলমান জনসংখ্যা বেড়ে হয় ৬,৭৬,৮৯৯ জন। শতাংশের হিসেবে হিন্দু ৪৯ শতাংশ এবং মুসলমান ৫১ শতাংশ। এই প্রথম জেলার জনসংখ্যা মুসলমানদের পক্ষে চলে যায়। জে এইচ টুল ওয়ালশ তাঁর A History of Murshidabad District গ্রন্থে লিখেছেন, 'The balance between Hindus and Mahomedans is no longer in favour of the Hindus, though the difference is not very great.' (Tull Walsh, p. 55)। উপরের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ— এই কয়েক বছরের মধ্যেই হিন্দু জনসংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় মুর্শিদাবাদ জেলা। *(সারণী দ্রষ্টব্য)*

সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ

থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ অবধি মুর্শিদাবাদ জেলা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা থেকে দেখা যাচ্ছে, জেলার হিন্দু জনসংখ্যার থেকে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা হিসেবে বেড়ে গেছে; মুর্শিদাবাদ জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় পরিণত হয়েছে। তারপর থেকে প্রতিটি জনগণনায় মুসলমান জনসংখ্যার হার বেড়েই চলেছে। ধারাবাহিকভাবে। পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের হিন্দুদের মতো অবস্থা হয়েছে এ জেলায় হিন্দুদের। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় হিন্দুদের শতাংশের হার কমে হয়েছে মাত্র ৩৩.২১ শতাংশ। জেলায় হিন্দুদের অবস্থ ক্রমান্বয়ে বিপন্ন হচ্ছে। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় হিন্দুদের শতাংশের হার কমে হয়েছে মাত্র ৩৩.২১ শতাংশ। জেলায় হিন্দুদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে বিপন্ন হচ্ছে। জেলার বাগড়ি অঞ্চল আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থান করছে। উগ্রপন্থী, জমি মাফিয়া, দেশবিরোধী, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের আঁতুড়ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে এই অঞ্চল। পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা অত্যাচারিত, বাস্তুচ্যুত হয়ে এই জেলাতেও দলে দলে এসেছে। ফলে ১৯৫১ ও ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার হার মোটামুটি একই থেকেছে। যদিও, হিন্দু উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে হিন্দু জনসংখ্যার হার বেড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বরং তার থেকে দ্রুত হারে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রধানত দুটি কারণে।

(১) মুসলিমদের মধ্যে জন্মহার বৃদ্ধি এবং (২) তৎকালীন পূর্ব- পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপকহারে মুসলমান অনুপ্রবেশ। ফলে, তথাকথিত 'সেকুলারবাদীদের' প্রবোধবাক্য সত্ত্বেও ধীরে ধীরে কয়েক দশকের ব্যবধানে হিন্দুপ্রধান জেলা থেকে মুসলমানপ্রধান জেলা হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা— যার অবস্থা পাকিস্তান বা বাংলাদেশের যে কোনো জেলার মতো। অথচ, এমনটি হবার কথা নয়। দেশভাগ-সহ স্বাধীনতার পরে হিন্দু উদ্বাস্তুদের এই জেলায় বেশি সংখ্যায় পুনর্বাসন দিলে জেলায় জনবিন্যাস এমনিই

সারণিতে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে জেলার ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা পরিবর্তনের হিসেব

জনগণনার বছর	হিন্দ জনসংখ্যা	মুসলমান জনসংখ্যা
১৯০১	৪৯%	৫১%
১৯১১	৪৭%	৫২%
১৯২১	৪৫%	৫৩.৬০%
১৯৩১	৪৪.০৮%	৫৫.২৪%
১৯৪১	৪১.৭৫%	৫৬.৫৫%
১৯৫১	৪৪.৬০%	৫৫.২৪%
১৯৬১	৪৪.০৮%	৫৫.৮৬%
১৯৭১	৪৩.৪৬%	৫৬.৩৪%
১৯৮১	৪১.১৫%	৫৮.৫৭%
১৯৯১	৩৫.৩৯%	৬১.৪০%
২০০১	৩৫.৯২%	৬৩.৬৭%
১৯১১	৩৩.২১%	৬৬.২৭%

পালটে যেত। কিন্তু সেটা হয়নি; কেন যে হয়নি সেটাও এক প্রহেলিকা। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্তাদের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীসুলভ ঔদাসীন্য এবং উটপাখিসুলভ নিঃস্পৃহতা এই সমস্যাকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। যদিও, আমার মনে হয়, ওই সময় জেলার জনবিন্যাস বদলে দিয়ে সমস্যা সমাধানের কথাও ভাবা হয়েছিল কোনো কোনো মহল থেকে।

এব্যাপারে কিছু ইঙ্গিতবাহী কথা লিখেছেন আইসিএস ও বামপন্থীঘেঁষা মুর্শিদাবাদ জেলার তৎকালীন জেলাশাসক অশোক মিত্র তাঁর 'তিন কুড়ি দশ' (তৃতীয় খণ্ড) নামক আত্মজীবনীতে। তিনি লিখেছেন, 'পদ্মার দক্ষিণ তীর বরাবর মুর্শিদাবাদ জেলার থানাগুলিতে যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সে বিষয়ে কী করা যায়। উত্তর-পশ্চিম থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত পরপর যে থানাগুলি ছিল, তাদের নাম ঔরঙ্গাবাদ, সুতী, জঙ্গীপুর, লালগোলা ও ভগবানগোলার— এগুলিতে সবথেকে বেশি চর ছিল। আমার পূর্বসুরি অস্পষ্ট ইঙ্গিত করে এমনভাবে এমন কথা ব্যবহার করলেন, তাতে মনে হলো মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি সি রায়ের নিজস্ব মত ছিল এই সম্পূর্ণ অঞ্চল থেকে মুসলমান বাসিন্দাদের দেশের বাইরে সমূলে বহিষ্কার করা। তাঁর কথায় মনে হলো তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ এই যে মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব অভীপ্সা এই হলেও সরকার এই মর্মে কখনও কোনো লিখিত বা মৌখিক 'আদেশ' জারি করেননি। 'তিনি সম্ভবত তাঁর পূর্বসূরি জেলা শাসক, আইসিএস ও লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়কে ইঙ্গিত করে কথাগুলি লিখেছেন। যাইহোক, তিনি আরও কিছু কথা লিখেছেন যা থেকে মনে হয়, কোনো কোনো মহল থেকে বিষয়টি নিয়ে ভাবা হয়েছিল। যদিও বিষয়টি বেশিদূর এগোয়নি। কিন্তু তাঁদের এই অবিমৃশ্যকারিতার ফলে আজও ভুগতে হচ্ছে জেলার সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজকে। মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে আরও দুটি জেলা যুক্ত হয়েছে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার তালিকায়— মালদহ ও উত্তর দিনাজপুর। আরও কয়েকটি জেলা এই তালিকায় যুক্ত হবার জন্য দিন গুনছে। এখন আমরা পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি, বিশেষকরে মুর্শিদাবাদ জেলা ঠিক কী কারণে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা থেকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাতে পরিণত হয়েছে তার কারণগুলি অনুসন্ধান করব।

প্রথমত, ১৭০৩-৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে জেলাটি দেওয়ানি দপ্তর এবং পরবর্তীকালে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা সুবার রাজধানী হবার কারণে মুসলমান দেওয়ান ও নবাব নাজিমের শাসনকেন্দ্র হবার কারণে জেলায় মুসলমানদের প্রাদুর্ভাব হয়। মুসলমান নবাব ও ধর্মপ্রচারকদের চাপে, কাজিদের অন্যায় বিচার পদ্ধতির ফাঁসে পড়ে এবং শাসকদের আনুগত্যলাভের আশায় জেলায় হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নবাবি আমলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। যদিও ধীরে ধীরে জেলাটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে এগিয়ে যায়। দেশবিভাজন ও স্বাধীনতার সময় জেলায় মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের শতকরা হার ছিল ৫৬.৫৫। দেশভাগের পরে এই জেলা থেকে

মুসলমানরা খুব বড়ো সংখ্যায় পাকিস্তানে যায়নি; আর যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমান পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশে গিয়েছিল তাঁরাও 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি, ১৯৫০-এর সুযোগ নিয়ে আবার ফিরে আসে, ফলে মুসলমান জনসংখ্যায় কোনো হেরফের হয়নি। এমতাবস্থায় যদি হিন্দু উদ্বাস্তুদের জেলায় ব্যাপকভাবে, পরিকল্পিতভাবে পুনর্বাসিত করা হতো তাহলে হয়তো জেলায় জবিন্যাস হিন্দুদের পক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব হতো এবং সেই সময়ে সেটাই স্বাভাবিক হতো। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক এবং আমলাতান্ত্রিক গড়িমসির কারণে সেটা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি।

এছাড়া ১৯৭১ থেকে ২০০১ খ্রিস্টাব্দ— এই তিন দশকে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার এবং বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে হিন্দু জনসংখ্যা ১৯৫১-তে ৪৪.৬ শতাংশ থেকে ২০০১-এ মাত্র ৩৫.৯২ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে ওই একই সময়ে মুসলমান জনসংখ্যা ৫৫.২৪ শতাংশ থেকে পৌঁছে গেছে ৬৩.৬৭ শতাংশে। ওই কারণগুলির সঙ্গে সাম্প্রতিককালে যুক্ত হয়েছে ভারত থেকে গোরু পাচার, চোরাচালান ও ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠীর একসঙ্গে কাজ করা, চোরাচালানকারীর ছদ্মবেশে জঙ্গিদের জেলায় অনুপ্রবেশ, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের ভোটব্যাংক অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে এঁদের মদত দেওয়া, চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিবাদের দরুন ধর্মীয়-সামাজিক সংঘর্ষ, খুন-জখম-অপহরণ ইত্যাদি বেড়ে যাওয়া, নারী পাচার, সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি থেকে হিন্দুরা ব্যাপকভাবে উৎখাত হওয়া, স্থানীয় প্রভাবশালী মুসলমান তথা চোরাচালান-কারীদের অল্পদামে হিন্দুদের জমি কিনে নেওয়া ইত্যাদি কারণে বিন্দুরা গ্রামের বসবাস উঠিয়ে শহরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে চলে আসছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাম আমলে তৈরি বর্গাদারি প্রথা যার ফলে হিন্দুদের হাত থেকে কৃষিজমি ব্যাপকভাবে মুসলমানদের হাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। যুক্ত হয়েছে হিন্দু মেয়েদের উপর নানা ধরনের চাপ, লাভজেহাদ; ফলে হিন্দু যুবতীদের সম্মান বাঁচিয়ে গ্রামে বসবাস করা দুরূহ হয়ে উঠেছে।

১৯৮০ সালের পর থেকে বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী মুসলমানেরা শাসক দলের সাহায্যে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, ভারতীয় নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট ইত্যাদি সবই পেয়ে যাচ্ছে। ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। সীমান্তের উভয় পার্শ্বের অপরাধীরাই ভারতীয় সীমান্ত অঞ্চল থেকে হিন্দুদের উৎখাত করার বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁরা সবসময়ই স্থানীয় মুসলমান লবির সাহায্য পাচ্ছে। ইসলামি কট্টরবাদীরা স্থানীয় মসজিদ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে প্রচার করছে যে, ভারতবর্ষ হলো আকবর, শাহজাহান, সিরাজদৌলার অর্থাৎ মুসলমানদের দেশ। হিন্দুরা ইংরেজদের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছে। এখন মুসলমানদের 'ফরজ' বা দায়িত্ব হলো, হিন্দুদের হাত থেকে দেশটা পুনরুদ্ধার করা। ডোমকল মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম থেকে হিন্দুরা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। ফলে গ্রামগুলি হিন্দুশূন্য হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, জেলার অন্যান্য গ্রাম থেকেও হিন্দুরা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে; আর হিন্দুশূন্য হয়েছে গ্রামগুলি। ডোমকল মহকুমার পুরাতন গোবিন্দপুরই হোক, রানিনগর থানার নটকুলী সংলগ্ন গ্রামটি অথবা জিয়াগঞ্জ থানার দুর্বাখালির পাশের গ্রামটি হোক বা বহরমপুর থানার শিয়ালমারা সংলগ্ন 'ভোলনা বা ভেল্লা'— সব গ্রামগুলিই হয়েছে হিন্দুশূন্য। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পাশগুলিতে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন এবং সেখানে গোরু ও মোষ প্রকাশ্যে জবাই করার আগ্রাসী মনোভাব, মুসলমানদের সরকারি রাস্তা সংলগ্ন নয়ানজুলি দখল ইত্যাদিতে হিন্দুরা ক্রমশই আড়ষ্টতায় ভুগে এলাকা পরিত্যাগ করছে; সরকারি প্রশাসন মৌন দর্শকমাত্র। এছাড়া আছে হিন্দু যুবতীদের অপহরণ করে বাংলাদেশে চালান দেওয়া। ফলে মুর্শিদাবাদের গ্রামগুলিতে হিন্দুদের বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মুর্শিদাবাদ একটি উদাহরণ মাত্র। কলকাতা-সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলার অবস্থাও একই রকম ভয়ংকর।

এমত অবস্থায় 'ধর্মনিরপেক্ষবাদিতার' মুখোশ থেকে রাজ্যের রাজনীতিবিদ ও অ্যাকাডেমিক বুদ্ধিজীবীদের বেরিয়ে আসতে হবে। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সমস্যাটি অনুধাবন করতে হবে এবং তার সমাধানে বাস্তবোচিত দিকনির্ণয় করে তা রূপায়ণ করে রাজ্যটিকে আরও একটি 'বাংলাদেশ' হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে।

তথ্যসূত্র :

১. A History of Murshidabad District— Major J.H. Tull Walsh. ২. Statistical and Geographical Report of the Moorshedabad District— J.E. Gastrell, Revenue Surveyor. ৩. Bengal District Gazetteers--- Murshidabad--- L.S.S.O' Malley. ৪. A Statistical Account of Bengal, Vol. IX— Districts of Murshidabad and Pabna--- W.W.Hunter, ৫. মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার (বাংলা)— বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের সম্পাদিত। ৬. তিন কুড়ি দশ (তৃতীয় খণ্ড), — অশোক মিত্র, আইসিএস। ৭. ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু--- প্রফুল্লকুমার সরকার, আনন্দ--- হিন্দুস্তান প্রকাশনী, কলকাতা। ৮. পশ্চিমবঙ্গে অশনিসংকেত— বিমল প্রামাণিক। ৯। বাংলা ও বাঙ্গালি— ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

পাঁচহাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতার কথা তুলে ধরতে পাঁচহাজার শিল্পকর্ম থাকছে নতুন সংসদ ভবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাঁচ হাজার শিল্পকর্মে সেজে উঠছে রাইসিনা হিলসের নতুন সংসদ ভবন, যা তুলে ধরবে ৫ হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ইতিহাস। নতুন ভবনের ৬৫ হাজার মিটার জায়গা জুড়ে শোভা পাবে প্রাচীন চিত্রশিল্প, আলংকারিক শিল্প, স্থাপত্য, ওয়াল প্যানেল এবং ধাতুর তৈরি নানা শিল্পকর্ম। ভারতের এই নতুন সংসদ ভবনটি গড়ে উঠছে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের অধীনে। ভারতীয় রীতি অনুসরণ করে একেবারে বাস্তুশাস্ত্র মেনেই তৈরি হচ্ছে সংসদের এই নতুন ভবন।

নতুন ভবনের ছয়টি প্রবেশ দ্বারে থাকছে মঙ্গলকর্ম এবং সম্প্রীতির প্রতীক বিভিন্ন প্রাণীর মূর্তি। এই প্রাণীগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাদের গুরুত্ব অনুসারে। ভবনের উত্তরদিকে আনুষ্ঠানিক প্রবেশদ্বারের পাহারায় রয়েছে গজমূর্তি। যা জ্ঞান, সম্পদ, বুদ্ধি ও স্মৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। বাস্তুশাস্ত্র মতে উত্তর দিকের অধিপতি হলেন বুধ। যা বুদ্ধিমত্তাকে তুলে ধরে। দক্ষিণের প্রবেশদ্বারে থাকছে অশ্ব। যা ধৈর্য, শক্তি ও গতির প্রতীক। পূর্বের প্রবেশদ্বারে রয়েছে ঈগল। যার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উত্তর-পূর্বের প্রবেশদ্বারে দণ্ডায়মান রাজহাঁস। এটি বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার প্রতীক। অন্যান্য প্রবেশদ্বারগুলির একটিতে আছে মকর (গঙ্গার বাহন, বিভিন্ন প্রাণীর দেহের সমন্বয়ে তৈরি এক প্রকার জীব), যা বৈচিত্র্য ও ঐক্যের প্রতীক। আরেকটিতে আছে শার্দূল (পুরাণে বর্ণিত বাঘ, সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী)। যা দেশের জনগণের সম্মিলিত ক্ষমতাকে বোঝায়।

সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা এক ঊর্ধ্বতন আধিকারিক বলেন, 'যেহেতু সংসদ দেশের মানুষের কথা তুলে ধরে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলে, তাই এই শিল্পকর্মগুলি সভ্যতা ও সংস্কৃতি উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারতীয় নীতি মূল্যবোধের কথা ব্যক্ত করবে।' দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সংবিধান প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত কৃতী ব্যক্তিদের ৬ টি গ্রানাইট পাথর নির্মিত মূর্তি থাকছে নতুন সংসদ চত্বরে। সংসদের দুই কক্ষের প্রত্যেকটির জন্য থাকছে চারটে করে গ্যালারি। তাছাড়াও একটি কনস্টিটিউশন গ্যালারি, তিনটি অনুষ্ঠান ভবন এবং অনেকগুলি ইন্ডিয়া গ্যালারি। এক হাজারেরও বেশি শিল্পী ও কারিগর এই পুরো স্থাপত্য শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ভারতীয় শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত দেশীয় শিল্পীদেরই এই প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে।

ভবনের ভিতরের প্রত্যেক দেওয়ালে নানা শিল্পকর্মের মাধ্যমে জনজাতি ও মহিলাদের অবদানের কথা তুলে ধরা হবে। এক দায়িত্বপ্রাপ্ত

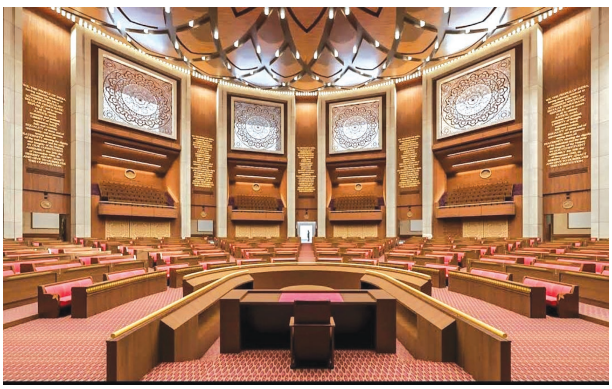

আধিকারিকের কথায়, 'ভবনের প্রত্যেক স্থাপত্য, চিত্রকলা ও কারুকাজ ৫০০০ বছরের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবরণ তুলে ধরবে। ভারতীয় প্রজ্ঞা, ভক্তি পরম্পরা, ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস শিল্পাকারে শোভা পাবে। এই নতুন ভবনের নির্মাণশৈলী এবং তার শিল্পকর্ম হবে ভারতের সনাতন পরম্পরার অনুসারী এবং বাস্তু শাস্ত্রমতে। সনাতন পরম্পরা হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যা শতাব্দী প্রাচীন। বাস্তুশাস্ত্র হলো ভারতের পারম্পরিক স্থাপত্য পদ্ধতি, যেখানে স্থাপত্যের গায়ে প্রাচীন লিপির মাধ্যমে নকশার সূত্র, বিন্যাস ও স্থানিক জ্যামিতির গঠন নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০-র ১০ ডিসেম্বর নতুন সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এখানে লোকসভা ও রাজ্যসভার দুই কক্ষে একসঙ্গে ১২২৪ জন সংসদ সদস্যের বসার সুবিধা রয়েছে। ভবনটি সম্পূর্ণ ভাবে ভূমিকম্প প্রতিরোধী। এটির নকশা তৈরি করেছে এইচসিপি ডিজাইন, প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড। নতুন ভবনটি পুরনো সংসদ ভবনের চেয়ে ১৭ হাজার স্কোয়ার ফুট বড়ো। নির্মিত হয়েছে ৬৪ হাজার ৫০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে যার দূরত্ব খুব সামান্যই। সেন্ট্রাল ভিস্তা রিডেভেলপমেন্টের আওতায় নির্মিত চারতলা নতুন সংসদ ভবনে লাউঞ্জ, লাইব্রেরি, কমিউনিটি হল, ক্যান্টিন ও পার্কের সুবিধাও থাকছে। চলতি বছরের মার্চের শেষের দিকে এই নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনের সম্ভাবনা রয়েছে।

‘স্ব’-এর আধারে রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের সংকল্প নিতে হবে

এবছর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা, গত ১২, ১৩, ১৪ মার্চ পানিপথের সেবা সাধনা, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র পট্টিকল্যাণা, সমালখা, হরিয়ানায় সম্পন্ন হয়েছে। সভায় সারা দেশ থেকে অখিল ভারতীয় অধিকারী ও কার্যকরী সদস্য, ক্ষেত্র কার্যকারিণী, প্রান্ত কার্যকারিণী, বিভাগ প্রচারক, নির্বাচিত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এবং আনুষঙ্গিক ৩৪টি সংগঠনের কার্যকর্তা-সহ ১৩৯১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তিন দিন ধরে সারা দেশে গত বছরে সঙ্ঘকাজ ও সামাজিক কাজের বিভিন্ন সমীক্ষা ও আগামী পরিকল্পনা করা হয় এবং একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

প্রস্তাব :

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের উদাত্ত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ভারতের ‘স্ব’ বা নিজস্বতার গৌরবময় যাত্রা আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস রূপে কাজ করেছে। বিদেশি আগ্রাসন এবং সংঘর্ষের সময়ে ভারতীয় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কালখণ্ডে পূজনীয় সাধুসন্ত ও মহাপুরুষদের নেতৃত্বে সমগ্র সমাজ নিরন্তর সংগ্রাম করে ‘স্ব’-কে রক্ষা করেছিল। এই সংগ্রামের প্রেরণা স্বধর্ম, স্বদেশি ও স্বরাজের ‘স্ব’-ত্রয়ীতে নিহিত ছিল এবং তাতে সমগ্র সমাজের যোগদান ছিল। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের পুণ্য লগ্নে সম্পূর্ণ রাষ্ট্র এই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী জননায়ক, স্বাধীনতা সেনানী এবং মনীষীদের কৃতজ্ঞতাপূর্বক স্মরণ করেছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রগতি করেছি। আজ ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনীতি হিসেবে বিকশিত হচ্ছে। ভারতের সনাতন মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংঘটিত এই নবজাগরণকে বিশ্ব স্বীকৃতি দিচ্ছে। ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’-এর ভাবনার আধারে বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব এবং মানবকল্যাণে ভারত নিজের ভূমিকা পালনে অগ্রসর হচ্ছে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার মত হলো, সুসংগঠিত, বিজয়ী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়ায় সমাজের সমস্ত শ্রেণীর জন্য মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ, বিবেকের সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব বিকাশের সঙ্গে আধুনিকী-করণের ভারতীয় চিন্তনের ভিত্তিতে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করার মতো কঠিন লক্ষ্যকে পূরণ করতে হবে। রাষ্ট্রের নবোত্থানের জন্য পরিবার নামক সংস্থার দৃঢ়ীকরণ, আত্মীয়তার ভিত্তিতে সমরস সমাজের নির্মাণ এবং স্বদেশি ভাবনার সঙ্গে উদ্যমের বিকাশ প্রভৃতি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিশেষ প্রয়াস করতে হবে। এই দৃষ্টিতে সমাজের সমস্ত ঘটক --- বিশেষ করে যুবসমাজের সমন্বিত প্রয়াসের প্রয়োজন। সংগ্রামের সময়ে বিদেশি শাসন থেকে মুক্তির জন্য যেমন ত্যাগ ও বলিদানের প্রয়োজন ছিল, তেমনই বর্তমানেও উপযুক্ত লক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্য নাগরিক কর্তব্যের প্রতি দায়বদ্ধ এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতা মুক্ত সমাজজীবন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাধীনতা দিবসে প্রদত্ত ‘পঞ্চ পণ’-এর আহ্বান গুরুত্বপূর্ণ।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা রেখাঙ্কিত করে জানাতে চায় যে, বিশ্বের অনেক দেশ ভারতের প্রতি সম্মান ও সদ্ভাব বজায় রাখছে, অন্যদিকে জগতের কিছু শক্তি ভারতের ‘স্ব’ আধারিত পুনর্জাগরণকে মেনে নিতে পারছে না। হিন্দুত্বের ভাবনার বিরোধী দেশের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শক্তি স্বার্থপরতা ও বিচ্ছিন্নতাকে উসকে দিয়ে সমাজে পারস্পরিক অবিশ্বাস, ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা ও অরাজকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র করছে। এদের সম্পর্কে সচেতন থেকে তাদের সমস্ত অপকৌশল ব্যর্থ করতে হবে।

ভারত কর্তৃক বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদানের সামূহিক উদ্যমের সুযোগ প্রদান করেছে স্বাধীনতার এই অমৃতকাল। ভারতীয় ভাবনার আলোকে সামাজিক, শৈক্ষিক, অর্থনৈতিক, গণতান্ত্রিক, বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে কালোচিত ব্যবস্থার বিকাশের এই কাজে সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে যোগদান করার জন্য অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা প্রবুদ্ধ সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছে। এর দ্বারা ভারত বিশ্ব মঞ্চে এক শক্তিশালী, বৈভবশালী এবং বিশ্বকল্যাণকারী রাষ্ট্ররূপে সমুচিত স্থান প্রাপ্ত করতে পারে। □

সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও সঙ্ঘের শাখা বেড়ে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গে যখন একের পর এক সরকারি, আধা সরকারি স্কুল বন্ধের ঘটনা ঘটছে, তখন উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে বিদ্যাভারতী পরিচালিত স্কুলগুলির। বিদ্যা ভারতী হোক বা বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদ ইদানীং তাদের পরিচালিত স্কুলগুলিতেই সন্তানদের ভর্তি করার জন্য লাইন দিচ্ছেন অভিভাবকরা। কিন্তু কেন? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু জানান, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় যে ব্যাপক দুর্নীতির ঘটনা খবরে উঠে আসছে, তাতে করে রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি জনগণের তীব্র অনীহা তৈরি হচ্ছে। স্কুলে স্কুলে ভুয়ো শিক্ষক ধরা পড়ার ঘটনায় অভিভাবকরা সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কিত। অন্যদিকে বিদ্যাভারতী বা বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের স্কুলগুলিতে পড়াশোনার মান অত্যন্ত উচ্চমানের। সারা ভারতজুড়ে তাদের পঠনপাঠন পদ্ধতি যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। শিক্ষার গুণগত মানও উন্নত। শুধু তাই নয়, সমাজের উচ্চশিক্ষিতরা এখানে শিক্ষাদান করে থাকেন। তাঁদের কাছে এখানে পড়ানোর অর্থ দেশমাতৃকার সেবা করা। কাজেই যেখানে উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষাদান করাই একমাত্র লক্ষ্য সেই প্রতিষ্ঠানে বাবা-মায়েরা সন্তানদের ভর্তি করতে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক। এদিন নরেন্দ্র মোদী সরকারের জাতীয় শিক্ষা নীতি নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ''বাঙ্গালি হিসেবে আমার গর্ব হচ্ছে, কারণ বর্তমান জাতীয় শিক্ষা নীতির পরিকাঠামো স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো বাঙ্গালিদের দেখানো পথেই গৃহীত হয়েছে।''

প্রসঙ্গত, গত এক দশক ধরে বিদ্যাভারতী পরিচালিত স্কুলের পড়ুয়ারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ২০১৯ সালে বীরভূমের সিউড়ির সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরের পড়ুয়া অরিত্র মাহারা মাধ্যমিকে রাজ্য ভিত্তিক দশম স্থান অধিকার করে। ড. বসু জানান, এই স্কুলগুলিতে দল-মত- ধর্মনির্বিশেষে পড়ুয়াদের ভর্তি নেওয়া হয়। প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পরম্পরা, নিয়মানুবর্তিতা, সহবত-সহ নানা আনুষঙ্গিক বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। যাতে করে পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে পড়ুয়াটি একজন দায়িত্বশীল ভারতীয় নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

এবছর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয় হরিয়ানায়। গত ১২, ১৩, ১৪ মার্চের তিনদিন ব্যাপী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ১৩৯১ জন প্রতিনিধি। সেখানে গৃহীত প্রস্তাব ও প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য গত ১৮ মার্চ সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে কলকাতার কেশব ভবনে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের পক্ষ থেকে এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু, প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায় এবং ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ড. জিষ্ণু বসু বলেন, পানিপথে সম্পন্ন এবারের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় পরিবেশ সংরক্ষণ, দেশের মানুষের সামাজিক সুরক্ষা এবং তাঁদের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি ভারতবাসীর ক্ষেত্রেই যাতে খাদ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করা যায় সেদিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, সারা দেশে এই মুহূর্তে মোট ৬৮ হাজার ৬৫১টি শাখা চলছে। যেখানে স্বয়ংসেবকরা দৈনিক ১ ঘণ্টার গঠনমূলক কার্যক্রমে অংশগহণ করেন।

দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায় পশ্চিমবঙ্গে শাখার কার্যপ্রণালীর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, '২০২০ সালে করোনা অতিমারী এবং ২০২১ সালে বিধানসভাভোট-পরবর্তী হিংসার প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকরা আবার সঙ্ঘের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। যে কারণে বিগত তিনবছরের নিরিখে ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে শাখার সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিপ্লব রায় জানান, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তে মার্চ ২০২২-এ যেখানে ১১৮৯টি শাখা, মিলন, মণ্ডলী ছিল; ২০২৩-এ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১২৭৫। মধ্যবঙ্গ প্রান্তে ২০২২-এ শাখা, মিলন মণ্ডলী ছিল ৮৭০টি। এবছর তা হয়েছে ১১৯৩টি। গত বছর উত্তরবঙ্গ প্রান্তে ৮৬০টি শাখা, মিলন, মণ্ডলী ছিল; ২০২৩-এর মার্চে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০৩৪। প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায় জানান, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ভারতমায়ের সেবায় নিবেদিত প্রাণ। কোনও প্রতিকূলতাই তাদের পথ রুদ্ধ করতে পারে না। তার প্রমাণ অতীতে বহুবার স্বয়ংসেবকরা দিয়েছেন।

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৩৭।।

আমেরিকাবাসী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। মাত্র তিনমাসের পরিবর্তে পাঁচ বছর আটমাস তিনি কাটালেন সেখানে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. স্টুডেন্ট হিসেবে তাঁর ভিসার পরিবর্তন হলো। ১৯৩৭ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি দিল। তবে এই জন্য তাঁকে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখতে হলো।

বিশ্বধর্ম সভা থেকে মহানামব্রতজীকে ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারি পদের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তখন তিনি ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন। পরে ৬৩টি শহরে তাঁকে ভাষণ দিতে হয়েছিল ৪৭৬টি।

(ক্রমশ)